ফিরে দেখা

গান্ধীজি ও নেতাজি

নারায়ণ সান্যাল

ফিরে দেখা :
গান্ধীজি ও নেতাজি

নারায়ণ সান্যাল

উৎসর্গ

মহাত্মাজির সঙ্গে যিনি
নোয়াখালিতে গ্রাম-পরিক্রমা
করেছেন, নেতাজির আদর্শে
যিনি সর্বান্তঃকরণে চিরকুমার
সেবাব্রতী, সাংসদ বা বিধায়ক
হবার প্রস্তাবে যিনি স্বীকৃত
হননি, ঊষাগ্রামের সার্বিক
উন্নয়নের যিনি প্রাণপুরুষ সেই
অশীতিপর-তরুণ অগ্রজপ্রতিম
গান্ধীবাদী

শ্রীগোপালচন্দ্র চক্রবর্তীকে

প্রীতি ও শ্রদ্ধাবনম্র
নারায়ণ সান্যাল

কৈফিয়ৎ

এ গ্রন্থে দুটি জীবনীভিত্তিক রচনা। দুটিই গত শতাব্দীতে রচিত। ভুল হল। বিগত সহস্রাব্দীতে। দুটিই সমকালীন মাসিক পত্রিকার পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথমটি আদ্যাপীঠের মুখপত্রে, দ্বিতীয়টি প্রসাদ পত্রিকায়। প্রথমটির রচনাকাল আমাদের স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী বৎসর, দ্বিতীয়টি নেতাজির জন্মশতবর্ষ।

গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে কতটা বাদ দেব কতটা যোগ করব এই চিন্তা করতে করতেই সহস্রাব্দী পালটে গেল।

প্রথম কৈফিয়ৎ : 'ফিরে দেখা'র বাসনায় বিগত শতাব্দীর এই দুজন ব্যক্তিত্বকেই বা কেন বেছে নেওয়া হল? আরও অনেক-অনেক যুগাবতার তো বিংশ শতাব্দীতে জ্যোতির্ময় সত্ত্বায় বিরাজমান? স্বামীজি না হয় মাত্র দুই বৎসরের জন্য বিংশ শতাব্দীতে পদচিহ্ন রেখে গেছেন। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, রাধাকৃষ্ণন, প্রফুল্লচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র, রামন, শরৎচন্দ্র প্রভৃতিরাও তো মূলত বিংশ শতাব্দীর। তাহলে?

আমাদের মনে হয়েছে এই দুজন মহাপুরুষকে স্বাধীনতা লাভের পর উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে, যে দুর্ভাগ্য অন্যান্য যুগান্তকারী ব্যক্তিত্বের ভাগ্যে ঘটেনি। কেন এমনটা মনে হল? তা বিস্তারিত বলে বোঝাবার চেষ্টা করেছি।

মহাত্মাজি সম্বন্ধে বর্তমান প্রজন্ম—বিশেষ করে বাঙালি—বেশ কিছু ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী। তার জন্য কিছুটা দায়ী বিগত প্রজন্মের মানুষ, অর্থাৎ আমরা—বুড়োবুড়ির দল। আমাদের কাছে সুভাষচন্দ্র ছিলেন কল্পলোকের রাজপুত্র—তাঁর আপোসহীন সংগ্রাম, তাঁর মহানিষ্ক্রমণ, সাইগঙ-রেডিও থেকে তাঁর উদাত্ত কণ্ঠস্বর এবং আজাদ-হিন্দ বাহিনীর সংগ্রামের বিবরণ শুনে আমরা তাঁর উপর দেবত্ব আরোপ করেছিলাম। তাই গান্ধীজির সম্বন্ধে আমাদের স্মরণে গাঁথা হয়ে আছে তাঁর বিশেষ কয়েকটি উক্তি : 'পট্টভি'জ ডিফিট ইজ মাই ডিফিট।' অথবা, 'দ্য স্পয়েল্ড চাইল্ড নীডস্ সাচ্ ট্রীটমেণ্ট', কিংবা 'আফটার অল, সুভাষ ইজ নট এ ট্রেইটার'।

আমরা এই জাতীয় উক্তিই মনে করে রেখেছি। আমরা ভুলে গেছি ওই গান্ধীজি একদিন বলেছিলেন, 'সুভাষ ইজ এ পেট্রিয়ট অব পেট্রিয়ট্স!' আমাদের ছেলে-মেয়েদেরও তাই বলেছি। তাদের মন বিষিয়ে দিয়েছি। জ্ঞানে বা অজ্ঞানে পরবর্তী প্রজন্ম—বিশেষ করে বাঙালী—তাই গান্ধীজিকে সহ্য করতে পারে না।

একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি :

সম্প্রতি একজন অতি উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসার আমাকে সস্ত্রীক সায়মাসে আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন। তাঁর সহধর্মিনী (এম. এ., বি. টি., একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের শিক্ষয়িত্রী) ডিনার টেবিলে আমাকে বললেন, 'আপনি যাই বলুন, ভারতবর্ষের

সবচেয়ে বড় সর্বনাশ করেছেন গান্ধীজি। তিনি যদি কংগ্রেসের তরফে ভারত-বিভাগ মেনে না নিতেন.....'

আমি বাধা দিয়ে বলেছিলাম, 'সে কী! গান্ধীজি তো আমৃত্যু দেশবিভাগের বিপক্ষে ছিলেন। তাছাড়া দেশবিভাগের সময় গান্ধীজির সঙ্গে তদানীন্তন কংগ্রেস নেতাদের কোনও সম্পর্কই তো ছিল না!'

উনি হেসে বলেছিলেন, 'আপনারা, মানে গান্ধীবাদীরা, তাই বলে বেড়ান বটে; কিন্তু সেটা বিকৃত ইতিহাস। গান্ধীজি রাজি না হলে কি নেহরু, প্যাটেল বা আজাদদের পার্টিশান মেনে নেবার হিম্মৎ হত? দীর্ঘ তিন দশক ধরে মহাত্মাজি আমৃত্যু ছিলেন কংগ্রেসের অবিসংবাদী কর্ণধার। এ কথা কে না জানে?

পাশের-চেয়ারে-বসা আমার অর্ধাঙ্গিনী যদি ঠিক সময়ে কনুইয়ের গুঁতোটা না মারতেন তাহলে আমি ভুলে যেতাম যে, উনি আমাদের ডিনারে নিমন্ত্রণ করেছেন। ডিনার টেবিলে বাকবিতণ্ডাটা অবাঞ্ছনীয়। আমি পুডিং-এর বাটিটা টেনে নিই।

তাছাড়া সাধারণ বাঙালীর ধারণা গান্ধীজি আমৃত্যু সুভাষের বিরুদ্ধাচরণ করে গেছেন, যেহেতু নেতাজির সশস্ত্র সংগ্রাম তাঁর অহিংসা-নীতির বিরুদ্ধে। তাই মনে হয়েছে, বাস্তব সত্যটা যা আমরা প্রত্যক্ষজ্ঞানে সেদিন জেনেছিলাম, বুঝেছিলাম, তা আগামী প্রজন্মের জন্য লিপিবদ্ধ করে যাওয়া আমাদের কর্তব্য।

মহাত্মাজির সমগ্র জীবন, তাঁর জীবনাদর্শ, স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অবদানের মূল্যায়ন আমি করতে চাইনি। শুধু সেই অসাধারণ মানুষটির তিন-তিনটি বিচিত্র বিস্মৃত পদযাত্রার কথা পাঠক মানসে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি এবং সেই সঙ্গে দেখাবার চেষ্টা করেছি : কারা, কী পদ্ধতিতে এবং কী উদ্দেশ্যে সেসব কথা ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করেছে। দিল্লির রাজঘাটে গান্ধীসমাধিতে গিয়ে পুষ্পার্ঘ্য দাও, কোনও আপত্তি নেই। তাঁর কী আদর্শ ছিল, স্বরাজ বলতে তিনি কী বুঝতেন; স্বাধীন ভারতের শাসকবৃন্দের আচরণবিধি কেমনতর হবে এসব কথা আলোচনা করা মানা। তাঁকে তো যথেষ্ট সম্মান আমরা দিয়েছি। একশ টাকার নোটে তাঁর মুখখানাই দেখতে পাবে। প্রতি দোসরা অক্টোবর সারা ভারতে ছুটি ঘোষিত হয়েছে। আবার কী চাই? একটা একশ টাকার নোটে গান্ধীজির গোটা মাসের ব্যক্তিগত সংসারযাত্রা নির্বাহ করা যেত — যাতায়াতের তৃতীয় শ্রেণীর রেলভাড়া সমেত। সারা জীবনে মানুষটি একটা দিন ছুটির মুখ দেখেননি; আর আমরা প্রতি দোসরা অক্টোবর দ্বিপ্রহরে হয় তাস খেলি, নয় টি. ভি. দেখি, আড্ডা মারি, নিদেন নিপাট নিদ্রা দিই।

স্বাধীন ভারতীয়ের জীবনে গান্ধীজি যদি আদৌ কোথাও থাকেন তবে আছেন, হয় বৈঠকখানায় ফটোর কালো ফ্রেমে বন্দি হয়ে, নয় শয়নকক্ষে আলমারির ভল্টে একশ টাকার নোটে, কালো-গার্ডারে ঘেরাও হয়ে।

সুভাষচন্দ্রের বিষয়ে অবস্থাটা ভিন্নতর। ১৯৪৫ সালে 'নেতাজি' শব্দটি উচ্চারণমাত্র আসমুদ্র-হিমাচলে একটা বিদ্যুৎ শিহরণ খেলে যেত। সে-সময় তিনি ছিলেন ভারতবর্ষের সবচেয়ে প্রিয় নেতা, সর্বাপেক্ষা আলোচিত ব্যক্তি, সবচেয়ে আদরের মানুষ। তার দীর্ঘ পাঁচ-ছয় দশক বাদে আজও সেই নামে বাঙালী উন্মাদ হয়ে ওঠে। শুধু বৃদ্ধ-বৃদ্ধা নয়, যারা তাঁকে চাক্ষুষ দেখেনি সেই তরুণ-তরুণীরাও। তাঁকে 'ভারতরত্ন' করার প্রস্তাবে দেশজুড়ে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়ে ওঠে। গোটা ভারতের ধারণা এভাবে তাদের প্রিয় নেতাজিকে জওহরলাল, বা প্যাটেলের সমমর্যাদা দেওয়া চলবে না! বুদ্ধদেব, অশোক, আকবর কি 'ভারতরত্নে'র খেতাবে ভূষিত? আজও অনেকে বিশ্বাস করেন—নেতাজি জীবিত। তিনি ফিরে আসবেন একশ চার বছর বয়সে!

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন পদ্ধতিতে নেতাজির স্মৃতির সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার করেছেন। কেউ চেয়েছেন গণমানস থেকে তাঁর স্মৃতি মুছে ফেলতে, কেউ চেয়েছেন সেই স্মৃতিটা সম্বল করে মুনাফা লুটতে। সুভাষপ্রেমীরা উন্মাদের মতো কখনো ছুটেছে কল্যাণীতে, কখনো শোলমারি সাধুর আশ্রমে—তিনি ফিরে এসেছেন শুনে। আর একদল রাজনীতি-ব্যবসায়ী আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে—সেই ১৯৪৫ সাল থেকেই—প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে যে, লোকটা তাইহকুতে মারা গেছে!

এই তো গতমাসে 'নেতাজি এনকোয়ারি কমিশনে', আদালতে সাক্ষ্য দিয়ে এলাম। আমাকে সমন পাঠানো হয়েছিল, ১৯৭০ সালে 'নেতাজি রহস্য সন্ধানে' নামে একটা কেতাব লিখেছিলাম বলে — নানা তথ্যের উপর হল সওয়াল-জবাব। সেখানে কী প্রশ্নোত্তর হয়েছিল তা লিপিবদ্ধ করার অধিকার আমার নেই, যতদিন না জাস্টিস শ্রীমুখোপাধ্যায়ের রায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু যে প্রশ্নোত্তর লিপিবদ্ধ করা হয়নি, বিচারকের আদেশে বাতিল হয়ে যায়, তার কথা নিশ্চয় বলা যেতে পারে। সেটা 'সাবজুডিস' নয়। তার কথা বলা আদালত অবমাননা নয়।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান এবং মিডিয়ার প্রতিনিধি হিসেবে চার-পাঁচজন অ্যাডভোকেট আমাকে পর্যায়ক্রমে সওয়াল করলেন—আমার গ্রন্থে মুদ্রিত বিভিন্ন তথ্যের বিষয়ে। আমার জবাব লিপিবদ্ধ করা হল। তার ভিতর একটি প্রশ্নোত্তর বাতিল হয়ে যায়। বিচারকের নির্দেশে তা নথিবদ্ধ করা হয়নি। সেই বাতিল প্রশ্নটির কথা বলি :

একটি রাজনৈতিক দলের তরফে জনৈক অ্যাডভোকেট আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, "Mr. Sanyal, would you kindly let the Court know the amount of money you have recived for writing the novel **Netaji Rahasya Sandhane?"**

জবাবে আমি বলেছিলাম, "Me Lord! I Consider my book as a travalogue and not a novel; secondly, I could like to answer the question after my learned friend let the Court know the amount of fees he has received from his client for harassing me in this Enquiry Commission."

মহামান্য আদালত আমাদের দুজনকেই admonish করেন এবং এই প্রশ্নোত্তর অবৈধ ঘোষণা করে তা কোর্টের নথি থেকে বাদ দেবার আদেশ দেন।

সেই বর্জ্য প্রশ্নোত্তরটি এখানে পাঠক-পাঠিকার সামনে তুলে ধরলাম এটা বোঝাতে যে, নেতাজির অন্তর্ধানের ছাপ্পান্নো বছর পরেও একদল ক্ষমতাশালী লোক কীভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে প্রমাণ করতে যে, নেতাজির মৃত্যু হয়েছিল তাইহকুতে, বিমান দুর্ঘটনায়।

শেষ কথা : এ গ্রন্থে প্রকাশিত যাবতীয় তথ্য ও মন্তব্যের জন্য লেখকই একান্তভাবে দায়ী—প্রকাশক বা মুদ্রাকর দায়ী নন।

নারায়ণ সান্যাল

ফিরে দেখা : গান্ধীজি

বিগত পঞ্চাশ বছরের হিসাবনিকাশ করলে বার বার মনে পড়ে অবহেলিত 'জাতির জনকে'র কথা। এই খেতাবটি তাঁকে দিয়েছিলেন একজন সংগ্রামরত স্বাধীনতার সৈনিক, সুদূর সাইগন ব্রডকাস্টিং স্টেশন থেকে। বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে। গান্ধীজির জন্মদিনে। তিনি তখন ব্রিটিশ কারাগারে বন্দি।

স্বাধীন ভারতে দুজনেই সমান উপেক্ষিত, অবহেলিত, অপমানিত। ভিন্ন ভিন্ন হেতুতে। প্রথমে পিতার কথা বলি, পরে পুত্রের প্রসঙ্গে আসা যাবে।

ইংরেজ শাসকেরা যখন বাধ্য হয়ে ভারত ত্যাগ করে গেল তখন তাদের শূন্য সিংহাসনে যাঁরা উঠে বসেছিলেন, তাঁরা কোনো নির্বাচনের মাধ্যমে শাসনদণ্ড লাভ করেননি। দুশো বছর দেশটাকে শোষণ করার পর বিদায়বেলায় ব্রিটিশ সরকার একটা মোক্ষম শেষ কামড় দিয়ে গেল, যাতে অদূর ভবিষ্যতে ভারত বিশ্বরাজনীতিতে কোনও সামনের আসন দখল করতে না পারে। এই দুশো বছর ইংরেজের শাসননীতি ছিল divide and rule! সেটা পরিবর্তিত হয়ে হল divide and exploit! বিদায় নেবার আগে তারা ভারতকে খণ্ডিত করে গেল। ভৌগোলিক হিসেবে তিন টুকরো, রাজনৈতিকভাবে দুই। ইংরেজ শাসকদলের কিছু বশংবদ নেতা এ কাজে তাদের সাহায্য করলেন। মুসলিম সমাজের স্বার্থে আদৌ নয়; সেই সমাজের অতি উচ্চপদস্থ নেতারা নিজেদের স্বার্থে—গোষ্ঠীগত, পরিবারগত এবং ব্যক্তিগত স্বার্থে—এই অপকর্মটিতে মদত দিলেন। 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' স্লোগান তুলে ব্রিটিশের প্রচ্ছন্ন সহায়তায় তারা 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে' ঘোষণা করল ১৬ আগস্ট, ১৯৪৬-এ। সাদা বাংলায় হিন্দুনিধন যজ্ঞ। যেহেতু ইংরেজ শাসকদলের গোপন সমর্থন বর্তমান, তাই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্যগুলিতে—উত্তর-পশ্চিম খণ্ড, সিন্ধু, পঞ্জাব ও বাংলায়—'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে' বীভৎস রূপ ধারণ করল। লুণ্ঠিত হল হিন্দুদের ধনসম্পত্তি, দলে দলে নিহত হল হিন্দু নরনারী।

অন্যান্য অঞ্চলে—যেখানে মুসলমানেরা সংখ্যালঘু—সেখানে এর প্রতিক্রিয়াও দেখা দিল অচিরে, প্রায় সমগ্র ভারতে। প্রথমদিকে হিন্দুদের ধনসম্পত্তি এবং প্রাণের ক্ষতি বেশি হলেও প্রতিশোধস্পৃহায় মুসলমান-নিধনও কম হয়নি। আন্দাজে বলা যায়—হিসেব কেউ করেনি, করলেও তা প্রকাশ করা হয়নি—প্রাক্ স্বাধীনতার ওই 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন' ও তার জের নিয়ে অবিভক্ত ভারতে হিন্দু এবং মুসলমান মারা গেছে প্রায় সমান সমান।

যে সমস্ত মুসলিম নেতা এই হত্যাকাণ্ডের সূচনা করেছিলেন—জিন্না, সুরাবর্দী প্রভৃতি, তাঁদের উদ্দেশ্য সফল হল। তাঁরা এমন একটা পরিস্থিতি গড়ে তুললেন যাতে মনে হল ভারত-বিভাগ অপরিহার্য।

বিভক্ত হলে পাকিস্তান-অংশের গদিতে উঠে বসতে পারবেন সেই সব ধনকুবের নেতা। শাসন-শোষণ চালাতে পারবেন। দাঙ্গায় কয়েক লক্ষ মুসলমান যে বুকের রক্ত দিল, তাতে তাদের কী লোকসান? এমনটা তো হয়েই থাকে!

জিন্নার মতে হিন্দু-ভারতের এবং কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মৌলানা আজাদের মতে গোটা ভারতের প্রতিনিধিত্ব তখন করছে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। ইংরেজ জিন্নার যুক্তিটাই মেনে নিল। বলল, তারা ভারত ছেড়ে যেতে রাজি আছে, যদি লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাব মেনে নিয়ে ভারতবর্ষকে রাজনৈতিকভাবে দ্বিখণ্ডিত করতে কংগ্রেস রাজি থাকে : ভারত ও পাকিস্তান। গান্ধীজি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভারত বিভাগের বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি একথাও বলেছিলেন যে ভারত যদি দ্বিখণ্ডিত হয়, তবে তা হবে তাঁর মৃতদেহের ওপর।

তা হয়নি। গান্ধীজির জীবিতকালেই, তাঁর তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও, ভারত দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল। অনেকের ধারণা : গান্ধীজির কথার খেলাপ হয়েছিল। তিনি শেষ মুহূর্তে ভারত-বিভাগে সম্মত হয়েছিলেন। তথ্যটা সম্পূর্ণ ভুল—নিতান্তই অসত্য! তবু বহু বিদগ্ধ রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবীকে আমি একথা বলতে শুনেছি। স্বাধীনতা লাভ করার মাত্র সাড়ে পাঁচ মাস বাদে গান্ধীজি নিহত হবার পর ভারত সরকার স্বাধীনতা সংগ্রামের যে ইতিহাস রচনা করেছেন তাতে সেভাবেই তথ্যটা প্রতিফলিত হয়েছে। যে কয়জন মুষ্টিমেয় ঐতিহাসিক এভাবে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস লিখতে রাজি হলেন না, অপরিসীম পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও তাঁদের নেপথ্যে সরে যেতে হল। উজ্জ্বলতম উদাহরণ—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অসাধারণ পণ্ডিত রমেশচন্দ্র মজুমদার। স্বাধীন ভারতে ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত ছাব্বিশ বছর ধরে তিনি একাদশ খণ্ডে ভারতবর্ষের একটি প্রামাণ্য ইতিহাস রচনা করেছিলেন—বৈদিকযুগ থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত তিন হাজার বছরের দীর্ঘ ইতিহাস। তারপর

তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনার জন্য সদ্যস্বাধীন ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রী আবুল কালাম আজাদ কর্তৃক আমন্ত্রিত হন। রমেশচন্দ্র আরও কয়েকজন প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ্‌কে নিয়ে কাজে ব্রতী হন; কিন্তু অচিরেই তিনি পদত্যাগ করে ফিরে আসেন। হেতু? শিক্ষামন্ত্রী যেভাবে স্বাধীনতার ইতিহাস লেখাতে চেয়েছিলেন, তাতে স্বীকৃত হতে পারেননি নিষ্ঠাবান ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র। কংগ্রেস-গণ্ডীর বাইরে যেসব আন্দোলন হয়েছে—নেতাজি সুভাষচন্দ্রের অবদান, আজাদ-হিন্দ ফৌজের ভূমিকা, নৌ-বিদ্রোহ, অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত গুপ্তবিপ্লবী প্রভৃতিদের কথা যথাযথ ঐতিহাসিক মর্যাদা দিয়ে ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস রচনা করায় শিক্ষামন্ত্রীর ঘোরতর আপত্তি। মহাত্মাজি যে আমৃত্যু ভারত-বিভাগের বিরুদ্ধে ছিলেন এ তথ্যটাও উহ্য রাখার ইচ্ছে ছিল শিক্ষামন্ত্রী তথা প্রধানমন্ত্রীর।

স্কুলপাঠ্য ইতিহাস থেকে স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ইতিহাসে তাই কোথাও লেখা হয়নি যে, মহাত্মা গান্ধীর প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও ভারত বিভক্ত হয়েছিল। অনবধানতাজনিত কারণে তাই সবাই ধরে নিই : গান্ধীজি একেবারে শেষ পর্যায়ে ভারত-বিভাগে সম্মত হয়েছিলেন। এ তথ্য ভ্রান্ত, এ কথা সর্বৈব মিথ্যা! এ বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে আমার একটি দুর্লভ অভিজ্ঞতা হয়েছিল ১৯৬২ সালে। সেকথা আমি অন্যত্র বলেছি। কিন্তু এই লেখার সঙ্গে সে অভিজ্ঞতা এমন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত যে, পুনরুক্তি দোষের আশঙ্কা সত্ত্বেও তা আমাকে এখানে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

যুগসন্ধিক্ষণের এই ঘটনাটি আমি প্রকাশ করেছিলাম আমার শততম গ্রন্থ 'এক দুই তিন'-এ। বিচিত্র ঘটনাপরম্পরা। সেটা জানতেন ওঁরা পাঁচজন এবং আমরা এগারোজন। এই ষোলোজনের ভিতর কেউই কখনো তা প্রকাশ করেননি। আনন্দবাজার পত্রিকায় ১৯৯৫ সালে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে ছাপা হয়েছিল—

> "পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ নবম ও দশম শ্রেণীর ইতিহাসের পাঠ্যক্রমের ভার লাঘব করার উদ্দেশ্যে নেতাজি-প্রসঙ্গে প্রায় সব ঐতিহাসিক তথ্যই বাদ দিয়েছে। সেই সঙ্গে বাদ পড়েছে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ও। সংশোধিত পাঠ্যক্রমে সুভাষচন্দ্র বসুর রাজনৈতিক কার্যাবলী, ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন, আজাদহিন্দ ফৌজের লড়াই ...১৯৪৬ সালের নৌ-বিদ্রোহ ইত্যাদি কিছুই থাকছে না। অথচ এসব বিষয় চলতি পাঠ্যক্রমে ছিল। এ বিষয়ে বামফ্রন্টের মন্ত্রী কান্তি বিশ্বাসকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, স্কুলের পাঠ্যক্রম ঠিক করে পর্ষদ। রাজ্য সরকার কখনও তাতে হস্তক্ষেপ করে না। নেতাজি প্রসঙ্গ বাদ পড়েছে কি না, তিনি এখনও জানেন না। পর্ষদের উপসচিব (শিক্ষা) ঈশিতা

> চট্টোপাধ্যায় সংশোধিত পাঠ্যক্রম সম্পর্কে একটি বিজ্ঞপ্তি বার করেছেন গত তেসরা ফেব্রুয়ারি ('৯৫)। তাতে বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট পাঠ্যক্রম ১৯৯৫-৯৬ শিক্ষাবর্ষ (অর্থাৎ নেতাজি জন্মশতবর্ষ) থেকেই কার্যকর হবে। অর্থাৎ আসছে মে মাস থেকে নতুন যে ইতিহাস বই পড়ানো হবে, তাতে এই সংশোধন থাকবে। সংশোধিত পাঠ্যক্রমে কংগ্রেসে নেতাজির ভূমিকার উল্লেখমাত্র থাকলেও তাঁর বাকি জীবন ও সংগ্রামের কথা কিছুই থাকবে না। ... নতুন শিক্ষাবর্ষে নবম ও দশম শ্রেণীতে ওঠা ছাত্ররা জানবে না, নেতাজি কীভাবে ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন। তাঁর অন্তরীণ থাকা, ছদ্মবেশে দেশত্যাগ, বিদেশের মাটিতে আজাদ-হিন্দ ফৌজ গঠন করে দেশের একাংশকে মুক্ত করার কাহিনী অজানা থেকে যাবে।"

এই যখন দেশের হাল তখন আমি যেটুকু তথ্য জেনেছি তা লিপিবদ্ধ করি। এতদিন করিনি। বিবেকের নির্দেশে। সার্ভিস কন্ডাক্ট রুলস বলে, "Barring judicial inquiries and those ordered by the Govt. or Parliament, no person shall give evidence, except with the prior sanction of the Government." আমি অবশ্য অবসরপ্রাপ্ত পেনশনভোগী; তবু বলি, না, আমি কোনো 'এভিডেন্স' দিচ্ছি না। কেন্দ্রীয় উপমন্ত্রীর কাছে যা শুনেছি তাই বিবৃত করছি। এতদিন প্রকাশ করিনি এই কারণে যে, যাঁর গৃহে আমন্ত্রিত হয়ে কাহিনীটা ১৯৬২ সালে শুনেছিলাম, তিনি ছিলেন তদানীন্তন ভারতের 'সিনিয়রমোস্ট' আই.সি.এস. অফিসার। তিনি আমাদের এগারোজনকেই মৌখিকভাবে বলেছিলেন তথ্যটা প্রকাশ না করতে।

তাহলে আজ লিপিবদ্ধ করছি কোন যুক্তিতে?

প্রথা বলে, ত্রিশ বছর অতিক্রান্ত হলে যে কোনো ঐতিহাসিক দলিল আর সরকারের গোপন তথ্য নয়, ইতিহাসের অধিকারে। যে যুক্তিতে মৌলানা আজাদের আত্মজীবনীর একটি বিশেষ অনুচ্ছেদ ত্রিশ বছর পরে প্রকাশিত হল; যে যুক্তিতে গান্ধীহত্যা মামলায় প্রতিবাদী নাথুরাম গডসের জবানবন্দি ত্রিশ বছর পরে প্রকাশ করা হল।

কৈফিয়ৎ দিয়েছি। এবার ঘটনাটা বিবৃত করি।

আমি তখন দণ্ডকারণ্যে ডেপুটেশনে কাজ করি। উড়িষ্যার কোরাপুটে, সেই ১৯৬২ সালে। এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার। তপশীল উপজাতির কমিশনার তথা পূর্ত, গৃহনির্মাণ ও সরবরাহ দপ্তরের উপমন্ত্রী অনিলকুমার চন্দ দণ্ডকারণ্য পরিদর্শনে এসেছেন। রাত্রে চেয়ারম্যান-সাহেব তাঁর বাড়িতে একটা নৈশভোজের আয়োজন করলেন। আমরা এগারোজন নিমন্ত্রিত ছিলাম; নয়জন বাঙালী, দুইজন বিদেশী—চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর,

মিস্টার অ্যান্ড মিসেস জনসন। দিনের বেলা অফিসিয়াল ওয়ার্কিং লাঞ্চ হয়েছে। এটা চেয়ারম্যান-সাহেবের ব্যক্তিগত সায়মাশের নিমন্ত্রণ।

চেয়ারম্যান তদানীন্তন ভারতের প্রবীণতম আই.সি.এস. স্বনামধন্য পদ্মবিভূষণ সুকুমার সেন।

কাহিনীটি বিবৃত করেছিলেন অনিলকুমার চন্দ 'আফটার ডিনার' খোশগল্পে। সুধীজনমাত্রেই জানেন, অনিল চন্দ ছিলেন তাঁর আমলে ভারতবিখ্যাত। লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্সের স্নাতক। বত্রিশ সালে তিনি শান্তিনিকেতন শিক্ষাভবনে যোগ দেন। পরের বছর থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণকাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন গুরুদেবের একান্ত সচিব। উনিশশো তিপ্পান্ন সালে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের অষ্টম অধিবেশনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন।

এত কথা বলছি বোঝাতে যে, যাঁর কাছে কাহিনীটা শুনেছিলাম তাঁর কথার কতটা গুরুত্ব। শ্রদ্ধেয় অনিল চন্দ প্রায় পনেরো বছর আগেকার একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা আমাদের শোনালেন সে রাত্রে—

ভারত তখন পরাধীন। জিন্না-ঘোষিত 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে' (১৬ আগস্ট, ১৯৪৬) অতিক্রান্ত। সমস্ত ভারত জ্বলছে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবহ্নিতে—বিশেষ করে পঞ্জাব, কাশ্মীর, বাংলা, কিছুটা উত্তরপ্রদেশ ও বিহার। দেশের নেতারা দিশেহারা। গান্ধীজি তখন সবরমতী আশ্রমে, আহমেদাবাদে। কী একটা কাজে মহাত্মাজির সঙ্গে পরামর্শ করতে অনিল চন্দ এসেছেন শান্তিনিকেতন থেকে। আছেন আশ্রমের অতিথিশালায়। মহাত্মাজির সঙ্গে কথা বলছেন, হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল। যন্ত্রটা ছিল দুজনের মাঝামাঝি। কিন্তু মহাত্মাজি ছিলেন শায়িত। তাই অনিল চন্দ রিসিভারটা তুলে শুনলেন। অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, বাপুজি, পণ্ডিতজি কথা বলছেন, ধরুন।

—পণ্ডিতজি! জওহার? দেহলিসে কেয়া?

হাত বাড়িয়ে যন্ত্রটা নিয়ে শুনলেন। তারপর অনেকক্ষণ নীরবে শুনে যা বললেন তা রীতিমতো চাঞ্চল্যকর সংবাদ। হ্যাঁ, জওহারলাল নেহরুই ও প্রান্তে কথা বলছিলেন; কিন্তু দিল্লি থেকে ট্রাংককলে নয়, আহমেদাবাদ স্টেশনের সুপারিন্টেন্ডেন্ট-এর ঘর থেকে। ওঁরা তিনজন এইমাত্র দিল্লি থেকে আহমেদাবাদ এক্সপ্রেসে মহাত্মাজির সঙ্গে দেখা করতে আহমেদাবাদে এসেছেন। অনিল চন্দ শুধু বললেন, ঔর দোনো কৌন? পণ্ডিতজি কে অলাবা?

—আজাদ ঔর প্যাটেল। লেকিন তুম যাতে হো কঁহা? ব্যয়ঠে রহো!

অনিল চন্দ এই পর্যায়ে আমাদের বলেছিলেন, বাপুজি তাঁর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে অথবা কোনো ঐশ্বরিক ক্ষমতায় হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন কেন ঐ তিনজন সর্বভারতীয়

নেতা অতর্কিতে গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করতে উপস্থিত হয়েছেন। আরও বলেছিলেন, 'জানি না, বাপুজি এ কথাও ভেবেছিলেন কি না যে ওঁরা তিনজন, উনি একা! তাই কি আমাকে উঠে যেতে বারণ করলেন?'

সমস্ত কথোপকথন আমার স্মরণে নেই। এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে স্মৃতির মণিকোঠা হাতড়ে আন্দাজে কিছু লেখা ঠিক হবে না। কথোপকথনের দু-তিনটি পঙক্তি শুধু মনে আছে। কারণ তা ভোলা যায় না। একবারমাত্র শুনে আপনারাও তা ভুলতে পারবেন না বাকি জীবনে। যেটুকু মনে আছে বিবৃত করি।

তার আগে একটা কাজের কথা বলে নিই। উনিশশো বাষট্টি সালে আমি পনেরো বছরের পুরনো যে ঘটনাটি শুনেছিলাম, সেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছয়জন স্বনামধন্য চরিত্রের সকলেই প্রয়াত—পাঁচজন স্বর্গে, একজন বেহেস্তে। সুকুমার সেন মশায়ের সেই নৈশভোজে আমরা যে এগারোজন ছিলাম তার ভিতর ছয়জন প্রয়াত, দুজন কোথায় আছেন জানি না। বাকি তিনজনের সন্ধান জানাতে পারি। আমি সস্ত্রীক জীবিত। আর আছেন দণ্ডকারণ্য প্রজেক্টের তদানীন্তন ডাইরেক্টর অফ পার্চেজ শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ সান্যাল—যাদবপুরের ইলেকট্রিকাল এঞ্জিনিয়ারিং-এর স্নাতক, বর্তমানে অশীতিপর তরুণ; আর ছিলেন তাঁর সহধর্মিণী, আমার দিদির সহপাঠিনী শ্রীমতী সুপ্রীতি সান্যাল, এম.এ., বি.টি.। বছর পনেরো আগে এঁর নাম সংবাদপত্রে দেখে থাকবেন। কারণ কোনো স্ত্রীশিক্ষায়তনের প্রধানা শিক্ষিকা হিসেবে অবসর নিয়ে তাঁর আজীবনসঞ্চিত প্রভিডেন্ট ফান্ডের লক্ষাধিক টাকা তিনি রামকৃষ্ণ মিশনকে দান করে দিয়েছিলেন। তিনি প্রয়াতা; কোনো পাঠক-পাঠিকার কৌতূহল চরিতার্থ করতে নয়, কোনো গবেষক বা জীবনীকারের প্রয়োজন হলে আমাকে চিঠি লিখবেন, হীরেন্দ্রনারায়ণের ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর জানাব।

স্মৃতিচারণটুকু এবার শেষ করি।

জওহারলালই আলোচনা শুরু করেন। যুক্তিতর্ক দিয়ে তিনি মহাত্মাজিকে বোঝাতে চাইছিলেন যে, মাউন্টব্যাটেনের প্রস্তাবিত 'ভারত-বিভাগ' স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া দেশের সামনে আর কোনো বিকল্প পথ খোলা নেই। প্রতিদিন অন্তত এক হাজার নরনারী নিহত হচ্ছে সমগ্র ভারতে। অর্ধেক হিন্দু, অর্ধেক মুসলমান। মহাত্মাজি জানতে চাইলেন এ বিষয়ে আজাদ ও প্যাটেল কী বলেন।

দুজনেই তাঁদের মতামত দিলেন। ওঁদের মতে পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে তাতে 'ভারত-বিভাগ' অনিবার্য। যত দেরি হবে ততই মৃতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। ওঁরা তিনজনে একমত হয়েই বাপুজির আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে এসেছেন।

মহাত্মাজি বেঁকে বসলেন। তিনি রাজি নন।

গান্ধীজির প্রতিক্রিয়া সমকালীন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। আমার মতো পক্কেশ প্রবীণদের স্মরণ হবে মহাত্মাজির উক্তি : 'ভারত যদি বিভক্ত হয় তবে তা হবে আমার মৃতদেহের উপর।'

এ-তথ্য ইতিহাসস্বীকৃত।

নতুন তথ্য যেটুকু অনিলকুমার পরিবেশন করেছিলেন তা এই : গান্ধীজি বলেছিলেন, এ্যাব লিংকনকেও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মীরা এবং তাঁর জেনারেলরা একই কথা একদিন বলেছিলেন : আমেরিকাকে দু-টুকরো করে ভ্রাতৃবিরোধের অবসান ঘটাতে। লিংকন স্বীকৃত হননি—তিনি প্রাণ দিয়েছিলেন, কিন্তু আমেরিকাকে দু-টুকরো হতে দেননি! আমরাই বা পারব না কেন? কংগ্রেসের ছোট ছোট সেবাদল গঠন করে, চলো আমরা এক-একজন ভারতের এক-একপ্রান্তে রওনা হই। ওঁরা তিনজন স্বীকৃত হতে পারেননি। আবার সবিনয়ে স্বীকার করি : কে কী বলেছিলেন তা পর পর সাজিয়ে নিয়ে বলতে পারব না। তার মধ্যে আমার কল্পনার ভেজাল অনিবার্যভাবে মিশে যাবে। তবে এটুকু মনে আছে, শেষ পর্যন্ত পণ্ডিতজি নাকি বলেন, বাপুজি, পার্টিশন ইজ নাউ এ সেট্‌ল্ড ফ্যাক্ট! আপনি যদি আমাদের সঙ্গে একমত না হতে পারেন তাহলে নিরপেক্ষ থাকুন। গান্ধীজি মানতে রাজি হননি। পণ্ডিতজির কণ্ঠে প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বেকার লর্ড কার্জনের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিলেন কি না তাও বলেননি। বলেছিলেন, না, আমি তো নিরপেক্ষ নই! আমি ভারত-বিভাগের বিপক্ষে। নিরপেক্ষ থাকতে যাব কেন?

প্যাটেল নাকি এই সময়ে বলেন, সেকথা তো আপনি আমাদের ইতিপূর্বেও জানিয়েছেন, বাপুজি। আমাদের তিনজনের বিনীত অনুরোধ—ওকথা প্রেসকে জানাবেন না!

গান্ধীজি একথায় নাকি বিরক্তি প্রকাশ করে বলেন, প্রেসকে আমি কখন কী বলব তার নির্দেশ আমি কি তোমার কাছে নিতে যাব, বল্লভভাই?

এই সময়, অনিল চন্দের স্মৃতিচারণ অনুসারে, সর্দার প্যাটেল নাকি একটা বেফাঁস উক্তি করে বসেন : তাহলে তো আমরা দেখতে বাধ্য হব যাতে আপনার স্টেটমেন্ট সংবাদপত্রে না পৌঁছয়।

মহাত্মাজি এতক্ষণ ছিলেন অর্ধশয়ান অবস্থায় আলাপচারী। একথায় হঠাৎ সোজা হয়ে উঠে বসলেন। প্যাটেলের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে সবিস্ময়ে বললেন : কেয়া কহা? ও, ইয়ে বাত হ্যয়! আভি সমঝ গয়া!

মুষ্টিবদ্ধ বলিরেখাঙ্কিত শীর্ণ দুটি হাত প্যাটেলের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলতে থাকেন, মুঝে অ্যারেস্ট করনা চাহতে হো? তো করো! লায়ে হো হ্যান্ডকাফ?

আজাদ ও জওহারলাল দুজনে একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়েন : ছি! ছি! ছি! এ কী বলছেন, বাপুজি! সর্দার ও কথা বলতে চায়নি মোটেই!

এতক্ষণ যা লিখেছি—কখনো ডাইরেক্ট ন্যারেশনে কখনো ইনডাইরেক্ট—তার অনেকটাই স্মৃতিনির্ভর, কিছুটা আন্দাজে, হয়তো বা কিছুটা কল্পনানির্ভর। কিন্তু এবার যে কয়টি পঙক্তি লিপিবদ্ধ করছি তা চার দশক ধরে আমার স্মৃতিপটের মণিমঞ্জুষায় সযত্নে সঞ্চিত হয়ে আছে —ছেনি, হাতুড়ি দিয়ে খোদাই করা ব্রাহ্মীহরফের শিলালিপির মতো!

মহাত্মাজি সখেদে বলে ওঠেন—হাঁ ! অব তুম তিনো ইয়ে কহ্ সকতে হো, কিঁউ কি মেরা বেটা তো ইঁহা নেহী হ্যয় না!

জওহারলাল সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেন, কিসকি বাত কর রহেঁ হ্যাঁয়, বাপু?

—ওয়হ্ বেটা! যো হমপর রুঠ কর ঘর ছোড় কর চলা গয়া! অব সুনা হ্যয় কি ওয়হ্ বার্তানিয়াকে সাথ লড়াই করতে হুয়ে শহীদ হো গয়া। অগর ওয়হ্ রহ্তা, তো ম্যয়ভি দেখ লেতা, ক্যায়সে তুম তিনো ...

গান্ধীজি 'সেন্টিমেন্টাল' ছিলেন, এমন অপবাদ তাঁর শত্রুতেও দেবে না। খুব সম্ভবত সেদিন বাক্যটা তিনি অসমাপ্ত রাখেননি। কিন্তু তার পনেরো বছর পরে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে অনিলকুমার চন্দ তা পারলেন না। তাঁর গলাটা ধরে এল। বাক্যটা অসমাপ্ত রেখেই চোখ থেকে চশমাটা খুললেন, এবং পকেট থেকে রুমালটা বার করলেন।

নেতাজি জন্মশতবর্ষ উদযাপনের কার্যক্রম হিসেবে আমাদেরই ভোটে নির্বাচিত সদাশয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার নাকি একবছর আগে থেকেই উদযোগী হয়েছিলেন—স্কুলপাঠ্য পুস্তক থেকে নেতাজি-বিতাড়নের সার্কুলার ইস্যু করে। তা যাক! কিন্তু মহাকাল তো কোনো 'চুনাও'-এর পরোয়া করে না। ইতিহাস তো কারও কাছে ভোট চাইতে আসে না। সেই ইতিহাসের তাই জানা থাকা দরকার যে, সুদূর সাইগনের বেতারে কোনো এক দোসরা অক্টোবর তারিখে ব্রিটিশ কারাগারের জনৈক বন্দিকে যিনি 'পিতৃসম্বোধন' করে সর্বপ্রথম 'জাতির পিতা' আখ্যা দিয়েছিলেন, সেই বুড়ো বাপও তাঁকে 'মেরা বেটা' সম্বোধন করেছিলেন—নিদারুণ অসহায়ত্বে, পরম নিঃসঙ্গতায়, চরম দুর্দিনে !

★ ★ ★

অনিলকুমার বর্ণিত সেবাগ্রামের ঐ ঘটনা সম্ভবত উনিশশো সাতচল্লিশ সালের মে মাসের। কারণ পুরাতন নথিপত্র ঘেঁটে দেখছি, মাউন্টব্যাটেন প্ল্যান নিয়ে কংগ্রেসের যে মিটিং হয়েছিল তার তারিখ সে বছরের দোসরা জুন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছাড়া সে সভায় বিশেষ অতিথিরূপে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন ডক্টর খান সাহেব, ডক্টর জয়রামদাস দৌলতরাম, জয়প্রকাশ নারায়ণ, রামমনোহর লোহিয়া এবং গান্ধীজি।

এই মিটিং-এ গান্ধীজি তাঁর উষ্মা প্রকাশ করে বলেন, মাউন্টব্যাটেন প্ল্যানে কী কী শর্ত আছে তা ইতিপূর্বে তাঁকে জানানো হয়নি। জওহারলাল ও প্যাটেল নীরব থাকেন এ অভিযোগের বিষয়ে। গান্ধীজি ব্যতিরেকে জয়প্রকাশ ও রামমনোহর প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। এই প্রসঙ্গে আরও বলি, মৌলানা আজাদের পরে স্বাধীন ভারতে প্রথম কংগ্রেস সভাপতি হয়েছিলেন আচার্য কৃপালনী, কিন্তু মহাত্মাজির তীব্র মনোবেদনার কথা জানতে পেরে, সেবাগ্রামে গিয়ে গান্ধীজির সঙ্গে কথা বলে, আচার্য কৃপালনী কংগ্রেস সভাপতি পদ থেকে পদত্যাগ করেন—মাত্র তিন মাসের মধ্যে, নভেম্বর, উনিশশো সাতচল্লিশে।

★ ★ ★

ভারতবর্ষ তিন-টুকরো হয়ে গেল। পশ্চিম-পাকিস্তান, পূর্ব-পাকিস্তান আর মাঝখানে ভারত। ভারত-বিভাগকে মেনে না নিলেও বাস্তব অবস্থাকে মানতেই হবে। স্বাধীন ভারতে যে সাড়ে পাঁচ মাস কাল জীবিত ছিলেন, গান্ধীজির জীবনে তার ভিতর কোনো পরিবর্তন আসেনি। আপনারা সবাই জানেন দিল্লির প্রার্থনাসভায় নাথুরাম গডসে গান্ধীজিকে হত্যা করে ত্রিশে জানুয়ারি ১৯৪৮। তারপর অর্ধশতাব্দী ধরে ভারতের শাসনব্যবস্থায় রাজনীতি-ব্যবসায়ীর দল, বণিক ও ধনিক সম্প্রদায় কীভাবে আমাদের সংবিধানকে কব্জা করে, নিজ নিজ স্বার্থে প্রশাসন ও পুলিশের মানের অবনমন ঘটিয়ে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছে দিয়েছে তা আপনাদের জানতে বাকি নেই। আমার বক্তব্য, এই শাসনব্যবস্থায় গান্ধীজির আদর্শ অথবা নেতাজির বিবেক-নির্দেশে আপোসবিহীন সংগ্রামের কোনো ভূমিকা নেই, থাকতে পারে না। তাই দুজনকে অতি সযত্নে ধীরে ধীরে গণমানস থেকে দূরে সরিয়ে রাখার ষড়যন্ত্রটা অর্ধশতাব্দীকাল নিরবচ্ছিন্নভাবে চালু আছে। পণ্ডিতেরা, বুদ্ধিজীবীরা তা জানেন। প্রকাশ্যে বলতে বা লিখতে সাহস পান না। কী লজ্জা!

ভারত যেদিন স্বাধীন হল সেদিন গান্ধীজি ছিলেন দাঙ্গা-বিধ্বস্ত কলকাতায়। তাঁর স্বপ্নের স্বাধীনতা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নজাতের। স্বাধীনতার আস্বাদ তিনি নিতে চেয়েছিলেন ঈশোপনিষদের আদিমন্ত্র—তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা—পন্থায়। ত্যাগের মাধ্যমে ভোগ করার আয়োজনে। স্বাধীন ভারতে তিনি জীবিত ছিলেন মাত্র সাড়ে পাঁচ মাস। পনেরোই আগস্ট ১৯৪৭ থেকে ত্রিশে জানুয়ারী ১৯৪৮ পর্যন্ত। আগেই বলেছি তাঁর জীবনযাত্রায় বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটেনি।

স্বাধীনতার প্রাগূষা লগ্নেই গান্ধীজি চেয়েছিলেন কংগ্রেস সংগঠনকে ভেঙে দিতে। সহজ যুক্তিতে। তাঁর মতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সৃষ্ট হয়েছিল একটিমাত্র লক্ষ্য নিয়ে— স্বরাজলাভ। তা সেই স্বরাজ যখন পাওয়া গেল, না হয় খণ্ডিত

অবস্থাতেই, তখন কংগ্রেসকে জিইয়ে রাখার কী হেতু? এঁরা বললেন, বাঃ! তাহলে ভারতবর্ষকে শাসন করবে কে? গান্ধীজির সহজ সমাধান—কংগ্রেস নয়, ভারত শাসিত হবে এক অভিনব সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। বিচিত্র কল্পনা ছিল বাপুজির। তাঁর পরিকল্পনায়—

প্রতিটি গ্রাম ও শহরাঞ্চলের প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ কংগ্রেস সেবাদলের ব্যবস্থাপনায় পঞ্চায়েতরাজ পদ্ধতিতে নির্বাচন করবে সেই সেই এলাকার সব চেয়ে সাচ্চা মানুষটিকে। রাজনৈতিক দলের হয়ে নয়, ব্যক্তিগত দেশসেবকের পরিচয়ে তাঁরা নির্বাচনপ্রার্থী হবেন। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে কেউ কোনো রাজনৈতিক দলে নাম লিখিয়েছিল সেটা ভুলে যেতে হবে। নির্বাচিত প্রতিনিধিকে কংগ্রেস দলভুক্ত হতে হবে এমন কোনো পূর্বশর্ত নেই। কারণ এবার তো নির্বাচন হবে ভিন্ন লক্ষ্য নিয়ে। ইংরেজ তাড়ানো নয়, স্বাধীনতা অর্জন নয়—দেশ শাসন। তিনি জেল খাটতে স্বীকৃত কি না, শহীদ হতে প্রস্তুত কি না এসব প্রশ্ন এখন অবান্তর। দেখতে হবে নির্বাচিত প্রতিনিধি সৎ, নিঃস্বার্থ, শিক্ষিত, বুদ্ধিমান এবং সমদর্শী কি না। দেশ শাসনের যোগ্যতা তাঁর আছে কি না। এভাবে এলাকাভিত্তিক প্রতিনিধিরা জেলাভিত্তিক এবং জেলাভিত্তিক প্রতিনিধিরা আবার রাজ্যভিত্তিক নেতা নির্বাচন করবেন। এই পদ্ধতিতে নির্মিত হবে সাচ্চা দেশপ্রেমিকের একটি আদর্শ পিরামিড। সত্যাশ্রয়ী, বিচক্ষণ, সুশিক্ষিত রাজ্যভিত্তিক নেতাদের ভোটে নির্বাচিত হবেন প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি।

কংগ্রেসের তদানীন্তন শীর্ষনেতারা ক্ষুব্ধ হলেন এ প্রস্তাবে। ব্যবস্থাটা আদৌ তাঁদের মনপসন্দ নয়। যে তখততৌসে অধিষ্ঠিত হয়ে সম্রাট শাহজাহাঁ মস্তকে ধারণ করেছেন কোহিনুর শোভিত রাজমুকুট, বাদশাহ জাহাঙ্গির সুদূর বঙ্গাল মুলুক থেকে শের আফগানের বিবাহিতা ধর্মপত্নীকে অপহরণ করে এনে নিজের হারেমজাত করেছেন, সেই ভারত সিংহাসনে আরোহণ করে টুয়েন্টি-ওয়ান কোর্স ডিনার নয়—শাকান্নে ক্ষুন্নিবৃত্তি? শ্যাম্পেনের পরিবর্তে ছাগদুগ্ধ? চার্চিল বর্ণিত নাঙ্গা ফকির হয়তো তা পারেন, ধনকুবের মতিলাল-তনয়ের পক্ষে তা অসম্ভব! গান্ধীজির প্রস্তাবটি গ্রহণ করা গেল না। কংগ্রেসই এল ভারত-শাসকের আসনে। কিন্তু কাঁটার মুকুট মাথায় পরিধানের গুরুদায়িত্ব কে নেবেন? ভাইসরয়ের ছেড়ে যাওয়া সিংহাসনে উঠে কে বসবেন? গান্ধীজি রাজি নন, সুভাষ অনুপস্থিত, জওহারলালই একমাত্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী। তিনিই হলেন প্রধানমন্ত্রী।

একই সপ্তাহে, অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসের তৃতীয় সপ্তাহে মহাত্মাজি

সংবাদপত্রে একটি মারাত্মক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। তার বিষয়বস্তু—রাজ্যপালদের আচরণবিধি। গান্ধীজির মতে যাঁরা রাজ্যপাল হবেন, তাঁদের পাঁচটি আবশ্যিক গুণ থাকা চাই। কী কী গুণাবলী?

এক : রাজ্যপাল মদ্যপান করতে পারবেন না।

দুই : তিনি খাদিবস্ত্র ছাড়া অন্য কোনো শৌখিন পোশাক করতে পারবেন না।

তিন : ইংরেজ শাসক নির্মিত গভর্নর্স প্যালেসে ('রাজভবন', যা গান্ধীজির মতে গ্রন্থাগার বা সংগ্রহশালা হতে পারে মাত্র) থাকবেন না। বাস করবেন অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার উপযুক্ত আবাসে।

চার : যে রাজ্যের রাজ্যপাল হবেন সেই রাজ্যের ভাষাজ্ঞান তাঁর থাকা চাই।

পাঁচ : তিনি অস্পৃশ্যতা বর্জন করবেন।

বুঝুন বখেড়া! নাথুরাম গডসে গান্ধীজিসৃষ্ট এ জাতীয় উটকো সমস্যার সমাধান না করতে পারলে হয়তো তাঁকে অনশনে আত্মহত্যা করতে হত।

সারা ভারতে বিগত পঞ্চাশ বছরে বোধ করি শতখানেক ভাগ্যবান ও ভাগ্যবতী রাজ্যপালের কঠিন দায়িত্ব পালন করতে গদিয়ান হয়েছেন। এঁদের মধ্যে একজনও ঐ পাঁচটি শর্ত পালন করতে পারেননি। সম্ভবত একজনমাত্র গান্ধীজির আদর্শের প্রায় কাছাকাছি আসতে পেরেছিলেন। এই অতিভঙ্গ বঙ্গদেশেই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ইংরেজি ভাষায় পি. এইচ. ডি. থেলোহঁকো হাতে হরেন্দ্রনাথ, যিনি অনাড়ম্বর জীবনযাত্রায় রাজভবনের এক কোণায় বাস করে স্বর্গারোহণের সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে পনের লক্ষ টাকা দান করে যান। যা এতদিনে সম্ভবত নয়ছয় হয়ে গেছে।

অন্যান্য রাজ্যপাল/পালিকারা রাজনীতি ব্যবসায়ী মন্ত্রীদের অনুকরণে বিলাসব্যসনে আকণ্ঠ ডুবেছিলেন এবং আছেন। কী করা যাবে? স্বাধীন ভারতে এমনটাই তো হয়ে থাকে! এস্তাই তো হোন্দাই রহ্‌তা। বিভিন্ন রাজ্যে ও কেন্দ্রে যাবতীয় সিকিমন্ত্রী, আধামন্ত্রী, পুরমন্ত্রী, পুরোমন্ত্রী, বুড়োমন্ত্রী, মুর্খমন্ত্রী, তিমিঙ্গিল প্রধানমন্ত্রীরা বিলাসের স্রোতে গা ভাসালেন। দু-চারজন চৌর্যাপরাধে গদিচ্যুতও হলেন, হাজতে গেলেন। নানাভাবে ম্যানেজ করে আবার রাজনীতি ব্যবসায়ে কেউ কেউ ফিরেও এলেন। কেউ-বা নিজেরা রইলেন অনিকেত বুড়োভাম হয়ে, তাঁদের ঘরওয়ালি অথবা পুত্র-কলত্র আকাশছোঁয়া সম্পত্তির অধিকারী হয়ে গেল রাতারাতি! সংক্ষেপে বলা যায়: আদিযুগ থেকেই স্বাধীন ভারতের শাসক-শোষকদের কাছে মহাত্মা গান্ধীর অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার ওই আদর্শ গ্রহণযোগ্য ছিল না। সে মতবাদ যে শুধু বিলাসবৈভব,

সুইস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে তাই নয়—'ডাইন্যাসটিক রুল' চিন্তাধারারও পরিপন্থী। অথচ বংশানুক্রমিক দাসত্ব করার বৃত্তি আমাদের মজ্জায় মজ্জায়—সেই ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দিল্লিতে দাসবংশ প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে। মহামহিম অ্যাডলফ হিটলার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে থার্ড রাইখ-এর শাসনকাল হবে সহস্রবর্ষব্যাপী। আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্যের শাসক আঁকজোকের হিসাবে যাননি, প্রাকৃতভাষে ছন্দোবদ্ধপদে ঘোষণা করেছিলেন—যব তক সামোসামে রহেগা আলু / তব তক বিহারমে রহেগা লালু। তাই তিনি যখন হাজতবাস করতে যান তখন তাঁর নিরক্ষরা সহধর্মিণী তাঁর শূন্য সিংহাসনে উঠে বসতে বাধ্য হন। আলুর বদলে রাবড়ি। উপায় নেই। এটাই বিহারের নিয়তি। তাই নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর কোনও উৎকোচগ্রহণে অসমর্থের ঠাঁই হয় না রাজনীতি-পাটোয়ারিদের দলে। তারা সাড়ম্বরে পাকড়াও করে নিয়ে আসে 'ডাইন্যাসটিক রুলের' শেষ সম্বল এক বিদেশিনীকে।

১৯৪২-৪৫ সালে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের আসামী হিসেবে পণ্ডিত জওহারলাল যখন আহমেদাবাদ জেলের ফার্স্টক্লাস কয়েদি অর্থাৎ সেই যখন তাঁর কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত সহযোগী একটি সংগ্রামরত বাহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং এগারোটি স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পাওয়া সরকারের রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে 'বাস্তব ইতিহাস' রচনা করছেন, তখন পণ্ডিতজি লিখছেন 'The Discovery of India'। সে গ্রন্থে লেখক প্রসঙ্গ-ক্রমে লিখেছিলেন যে, একবার কোনোক্রমে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারলে বিপ্লবীর মানসিকতায় পরিবর্তন হয়। সে পূর্বপ্রতিশ্রুতি ভুলে যায়। সে স্বার্থান্ধ হয়ে পড়ে—নিজ গোষ্ঠী, নিজ পরিবার এবং নিজের আখের গোছাতে বসে যায়। তার বাইরে সে আর কিছু দেখতে পায় না।

পাছে পাঠক এই জটিল তত্ত্বটা প্রণিধান করতে না পারে তাই জেলখানা থেকে ছাড়া পেয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই তিনি নিজে এই তত্ত্বের একটা সহজবোধ্য প্র্যাকটিকাল ডেমনস্ট্রেশন দিয়ে গেলেন। জওহারলালের কথা থাক। তাঁর পূতাস্থি তো এ্যারোপ্লেন থেকে সারা ভারতের সব নদনদীতেই বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। আমরা গান্ধীজির কথা বলছিলাম। সেই আলোচনাই করা যাক।

★ ★ ★

গান্ধীজি দিনে দু-বার পায়ে হেঁটে বেড়াতে বার হতেন। প্রাক্‌সূর্যোদয় মুহূর্তে একবার, সূর্যাস্ত সময়ে আর একবার। ঝড়ঝঞ্ঝা-বজ্রপাতেও তাঁর পদচারণা বন্ধ থাকত না। প্রয়োজনে ছাতা মাথায় হাঁটতেন। শেষ জীবনে ওঁর দুপাশে দুজন কন্যাপ্রতিম সেবিকাও হাঁটতেন। কাজের টান যতই থাক (আর কবেই বা তা না থাকত?) এই পদচারণা তাঁর কাছে আহার-নিদ্রা-প্রার্থনার মতোই নিত্যকর্ম। অনেক সময় পদচারণাকালে তিনি

সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের ইন্টারভিউ দিতেন।
ওঁর জীবনের তিনটি বিশেষ পদযাত্রা ইতিহাস রচনা করেছে। তিনটি ভিন্ন ভূখণ্ডে, তিনটি ভিন্ন কালে এবং তিনটি ভিন্ন প্রয়োজনে। এসব কথা আপনারা হয়তো ভাসাভাসা জানেন—তোমরা জান না, দাদাভাই, দিদিভাই-এর দল! স্বাধীনতার সাড়ম্বর সুবর্ণজয়ন্তী অতিক্রান্ত হবার পর সেই তিনটি ঐতিহাসিক পদযাত্রার পুনরালোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তিনজন নিষ্ঠাবান সাংবাদিক মহাত্মাজির পদরেখা ধরে সেই বাতাবরণটি দেখে এসেছিলেন। India Today পত্রিকায় তাঁরা তিনটি প্রবন্ধও প্রকাশ করেছিলেন সুবর্ণজয়ন্তী স্বাধীনতা সংখ্যায়। আপনারা অনুমতি করলে সেই পদচিহ্নরেখা ধরে আমরাও মানস ভ্রমণ করতে পারি। তাতে বুঝে নেওয়া যাবে, ভারতের শাসক-শোষকদের সুবন্দোবস্তে জাতির জনক কীভাবে অবহেলিত, বিস্মৃত, অবজ্ঞাত—টোটাল অ্যানহিলিয়েশন!

★ ★ ★

গান্ধীজির জীবনীকার বলেছেন, সকালে আধঘণ্টা এবং বিকালে আধঘণ্টা মিলিয়ে তিনি দৈনিক গড়ে এক ঘণ্টা হাঁটতেন। আরও বলেছেন, তাঁর গতিবেগ ছিল অত্যন্ত দ্রুত। ঘণ্টায় গড়ে সাড়ে পাঁচ মাইল। প্রায় আট-নয় কিলোমিটার। ধরুন যদি পাঁচ মাইলই হয়, তাহলে বছরে প্রায় আঠারোশো মাইল। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে তিনি ভারতবর্ষে ফিরে এসেছিলেন ১৯১৫ সালে। ফলে তেত্রিশ বছরে অঙ্কশাস্ত্রমতে তিনি ষাট হাজার মাইল হেঁটেছেন। এর ভেতর জ্বরজারি অসুস্থতা তাঁকে কখনো প্রার্থনা বা পদচারণা থেকে প্রতিহত করতে পারেনি। তবে হ্যাঁ, অনশন করলে অথবা ব্রিটিশ জেলে বন্দি থাকলে তাঁর নিত্যকর্মপদ্ধতিতে ছেদ পড়েছে। প্রার্থনায় নয়, পদচারণায়। তবু ধরুন পঞ্চাশ হাজার মাইল তিনি এভাবে হেঁটেছেন। দূরত্বটা আন্দাজ হচ্ছে? বিষুবরেখা বরাবর গোটা পৃথিবীকে দু-দুবার পাক মারা!
এর ভেতর তিনটি বিশেষ পদযাত্রা আমরা পিছন ফিরে দেখব।
এক : চম্পারন, বিহার, ১৯১৭ ... পদপ্রদর্শক সাংবাদিক স্বপন দাশগুপ্ত।
দুই : দান্ডী মার্চ, গুজরাট, ১৯৩০ ... জানাচ্ছেন সমর হালারঙ্কর।
তিন : নোয়াখালি পরিক্রমা, বাংলাদেশ, ১৯৪৬ ... সুদীপ চক্রবর্তী।

এক : বিস্মৃত নগণ্য গ্রাম: চম্পারন, বিহার : ১৯১৭
চম্পারন জেলাটি উত্তর বিহারে। তার উত্তরে ও পুবে নেপাল রাজ্য, পশ্চিমে সপ্তগণ্ডকের প্রবাহ, দক্ষিণে বিহার রাজ্যের অন্যান্য জেলা—সীতামারি, মজঃফরপুর। গান্ধীজি যখন ওখানে যান—সেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষাশেষি এবং জালিয়ানওয়ালাবাগের

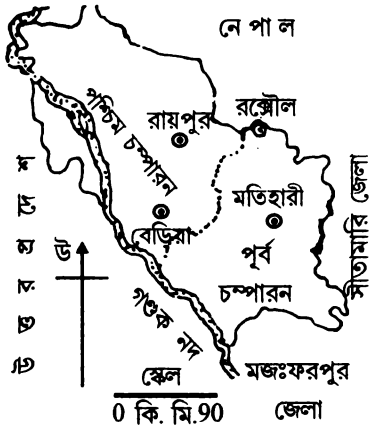

হত্যাকাণ্ডের বছর দুই আগে, তখন এই চম্পারন জেলাটি ছিল অতি বৃহৎ। উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্ব— কয়েক শত মাইল। স্বাধীনতার পর চম্পারন জেলা দু-টুকরো হয়ে গেছে। পূর্ব ও পশ্চিম চম্পারন। বেতিয়া তার একটি অতি নগণ্য গ্রাম—বর্তমানে পশ্চিম চম্পারনে অবস্থিত। গণ্ডক নদী থেকে মাইল দশেক পুবে। সেখান থেকেই যাত্রা শুরু করেছিলেন গান্ধীজি— সরেজমিনে তদন্ত করতে—ইংরেজ নীলচাষীদের ওপর কী জাতের অত্যাচার চালাচ্ছে—অনাহারক্লিষ্ট অনপড় গাঁওয়ার মানুষগুলোর ওপর।

আমাদের মনে রাখতে হবে, গান্ধীজির চম্পারন পদযাত্রার ছাপ্পান্ন বছর আগে— রবীন্দ্রনাথের জন্মবৎসরে, প্রয়াত হয়েছিলেন হিন্দু-প্যাট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদক, নীলচাষীদের বন্ধু হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। মাত্র সাঁইত্রিশ বছর বয়সে। মৃত্যুর পূর্ব বৎসর নীল কমিশনের সম্মুখে তিনি নীলকরদের অমানুষিক অত্যাচারের সাক্ষ্যপ্রমাণসহ এজাহার দেন। তাঁর বলিষ্ঠ প্রতিবাদে বারাসাতের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অ্যাশলি ইডেন ঘোষণা করেছিলেন—নীলচাষ কৃষকদের ইচ্ছাধীন। হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর চারণকবি গেয়েছিলেন, 'অসময়ে হরিশ মল, লঙের হল কারাগার/চাষীর এবার প্রাণ বাঁচানো ভার।'

সেই নীলচাষীদের অত্যাচার স্বচক্ষে দেখতে এলেন গান্ধীজি। বাস্তবে নীলচাষ তার পূর্বেই কিন্তু ভারতবর্ষ থেকে প্রায় উঠে গেছে। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটকের প্রভাবে নয়। মাইকেলের অনুবাদের জন্য নয়, ফাদার লঙের কারাগার বা কালীপ্রসন্ন সিংহের হাজার টাকার খেসারতের জন্যেও নয়—সম্পূর্ণ ভিন্ন হেতুতে। ইতিমধ্যে বিজ্ঞানীরা ল্যাবরেটরিতে 'সিন্থেটিক নীল' আবিষ্কার করে বসেছেন। চাষে উৎপন্ন নীলের চেয়ে তার বাজারদর কম পড়ছে। তবু চম্পারন এলাকায় যেসব ইংরেজ নীলকুঠি বানিয়ে ব্যবসা করছিলেন তাঁরা তখনো ব্যবসাটা চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। সিন্থেটিক নীল-এর চেয়ে কৃষিজাত নীলকে আরও সস্তা করা যায় কি না সেই শেষ চেষ্টা পরীক্ষা করে দেখতে—অর্ধভুক্ত চাষীদের অভুক্ত রেখে, অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি করে।

গান্ধীজি মতিহারি থেকে একটা তৃতীয় শ্রেণীর রেল-কামরায় চেপে বেতিয়াতে এসে পৌঁছলেন উনিশশো সতেরো সালের এগারোই অক্টোবর। অর্থাৎ তাঁর আটচল্লিশতম জন্মদিনের নয় দিন পর।

বেতিয়ার থানায় সি.আই.ডি.-র জমা দেওয়া জীর্ণ রিপোর্টখানির পাঠোদ্ধার এই আশি বছর পরেও করতে পেরেছেন সাংবাদিক স্বপন দাশগুপ্ত—

প্রায় হাজারচারেক স্থানীয় মানুষ স্টেশনে জড়ো হয়েছিল মিস্টার গান্ধীকে স্বাগত জানাতে। ট্রেনটা স্টেশনে দাঁড়ালো। একটি তৃতীয় শ্রেণীর কামরা থেকে নেমে এলেন মিস্টার গান্ধী। পরনে খাটো খদ্দরের ধুতি। খালি গা। তবে তাতে একটা খদ্দরের চাদর জড়ানো। এক হাতে লাঠি, অপর হাতে পোর্টম্যান্টো ব্যাগ। পায়ে চপ্পল। জনতা পুকার দিয়ে ওঠে—গাঁধি মহারাজ কি জয়!

দূর দূর গ্রাম থেকেও কিছু চাষী, মহিলা ও কাচ্চাবাচ্চা এসেছিল। তারা মিস্টার গান্ধীর ওপর ফুল ছিটিয়ে দিল।

মিস্টার গান্ধী উঠলেন হাজারিমলের ধরমশালায়। বেতিয়ার বেনিয়া সুরজমল মাড়োয়ারি তার ফিটন গাড়ি নিয়ে স্টেশনে হাজির ছিল। সেই গাড়িতে চেপে মিস্টার গান্ধী ধরমশালায় চলে গেলেন।

ডি. জি. তেন্দুলকরের লেখা একটি বইতে গান্ধীজির ওই চম্পারন অভিযানের কিছু বিবরণ আছে। বইটির নাম 'Gandhi in Champaran' (চম্পারনে গান্ধী)। তাতে হাজারিমল ধরমশালার একটি আলোকচিত্র আছে। বাড়িটি কালের কবলে বর্তমানে প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত। গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে সেটা মেরামতের ব্যবস্থা তো হয়ইনি, এমনকি একটা ফলক বসানোর প্রয়োজনও কেউ বোধ করেনি। না কোনো বিহারের সরকারি কর্মচারী, না রাজনৈতিক বেওসায়ী, না কোনো ভোটপ্রার্থী।

মানুষ ভুলে গেলেও বেতিয়া-গ্রাম কিন্তু গান্ধীজিকে ভোলেনি। তাঁর স্বহস্তরোপিত একটি বৃক্ষ আজ ফলভারনম্র। আজ্ঞে না, গাছ নয়, বৃক্ষ শব্দটা আলঙ্কারিক প্রয়োগ। বাস্তবে একটা প্রাথমিক বিদ্যালয়। মতিহারি থেকে ন-দশ মাইল দূরে বারহারওয়া গ্রামে গুটিকতক ছাত্রকে নিয়ে গান্ধীজি একটি স্কুলবাড়ি খুলেছিলেন। চোদ্দই নভেম্বর উনিশশো সতেরো সালে। জমি-বাড়ি দান করেছিলেন স্থানীয় ভূস্বামী বাবু শিবগুণ মাল। চম্পারন জেলায় সেটাই নাকি প্রথম 'নেটিভ পাঠশালা'।

ভারতের সুবর্ণজয়ন্তী বছরে সাংবাদিক স্বচক্ষে দেখে এসেছেন সেই প্রাইমারি স্কুল এখন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। ছাত্র সংখ্যা সাড়ে চারশো এবং ছাত্রী আড়াইশো। শিক্ষক সংখ্যা ষোলো। প্রবেশপথে মহাত্মাজির একটি আবক্ষ মর্মরমূর্তি, স্কুলের নামও গান্ধীজির নামে।

প্রথম যুগে গান্ধীজি যাঁকে স্কুলের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেন তাঁর পুত্র পরমদেও রাউথ পিতার স্বর্গলাভে কেয়ার-টেকারের পদটি পেয়েছিলেন স্বাধীনতার তিন বছর পরে। সম্প্রতি, এই উনিশশো বিরানব্বই সালে পরমদেও অবসর পেয়েছেন; কিন্তু সেই স্কুলেই থাকেন তিনি—চাকরির টানে নয়, শ্রদ্ধা-প্রীতি-ভালবাসার টানে। স্কুল কর্তৃপক্ষ তাঁকে থাকতে অনুমতি দিয়েছেন। তাঁর কাছে আজীবন ছিল একটি অমূল্য সম্পদ—যে চরকায় গান্ধীজি ওই বেতিয়ায় অবস্থানকালে সুতো কাটতেন। কিন্তু পঞ্চায়েত সেটি রাউথের কাছ থেকে অধিগ্রহণ করে স্কুলঘরের একটা বাঁশের সঙ্গে বেঁধে ঝুলিয়ে রেখেছেন। সেই ঘরটিতে কোনও বাতির ব্যবস্থা নেই। বর্ষায় ছাদ দিয়ে জল পড়ে। আশঙ্কা : আর দু-চার বছরের মধ্যেই সেই অব্যবহার্য মাটির ঘরটা মুখ থুবড়ে পড়বে। তার নীচে চাপা থাকবে কাঠের চরকাখানা।

আচ্ছা, কাঠ শুনেছি নাকি লাখ লাখ বছর মাটির তলায় চাপা থাকলে পাথর হয়ে যায়। তাই নয়? তাহলে সুদূর ভবিষ্যতে হয়তো কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক বেতিয়াতে মাটি খুঁড়ে পেয়ে যাবেন একটা চরকার ফসিল!

নীলচাষীদের ব্যবসার রবরবা ছিল ১৮৮২-১৮৮৪ সালে। সে আমলে বছরে চল্লিশ লক্ষ পাউন্ড মূল্যের নীল ভারত থেকে ইউরোপে রপ্তানি করা হত। গত শতাব্দীতে আটের দশকে যা ছিল চল্লিশ লক্ষ পাউন্ড আজ তার মূল্যমান কত? হাওলা-গাওলা-বোফর্সের কত গুণ ? সাংবাদিক দাশগুপ্ত লিখছেন, '.....according to the testimony of a British official in 1848, 'Not a chest of indigo reached England without being stained with human blood.' (আঠারশো আটচল্লিশ সালে একজন ব্রিটিশ অফিসার তাঁর এজাহারে বলেছিলেন, 'ভারত থেকে জাহাজে করে যে সব নীলের পেটি ইংল্যান্ডে আসত তার প্রত্যেকটির গায়ে লেগে থাকত নেটিভ মানুষের রক্ত।')

চম্পারনে বড়সাহেবদের ব্যবহারের জন্য যে বিরাট ক্লাবঘরখানা ছিল, সেটা কিন্তু আজও টিকে আছে। বিশাল নীল ফ্যাক্টরির জমির একান্তে একটা প্রাথমিক বিদ্যালয়। সে স্কুলে ছাত্ররা স্বাধীনতার ইতিহাস পড়ে। সে ইতিহাস বইয়ে জাতির পিতার উল্লেখ অবশ্য আছে; কিন্তু তিনি যে স্বয়ং চম্পারনে এসেছিলেন এ কথার উল্লেখ নেই।

গান্ধীজির চম্পারন ভ্রমণকালে বেতিয়ার স্থানীয় এস.ডি.ও. ডাব্লু.এইচ.লিউইস্ তাঁর বড়সাহেব ডিভিশনাল কমিশনারের কাছে যে গোপন রিপোর্টটি পাঠিয়েছিলেন সেই ধুলিমলিন বিবর্ণ রিপোর্টখানিও সাংবাদিক দাশগুপ্ত উদ্ধার করতে পেরেছেন:

> We may look on Mr. Gandhi as an idealist, a fanatic, or a revolutionary according to our own particular individual opinions, but to the raiyats he is their liberator, and they credit him with extraordinary powers. He moves about the villages asking them to lay their grievances before him, and he is daily transfiguring the imagination of masses of ignorant men with visions of an early millennium. (আমরা আমাদের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গিতে মিস্টার গান্ধীকে নানান বিশেষণে বিভূষিত করতে পারি; আদর্শবাদী, সংস্কারাচ্ছন্ন অথবা বিপ্লববাদী। কিন্তু গ্রামবাসী চাষীদের চোখে তিনি ওদের মুক্তিপথের অগ্রদূত! তাদের ধারণায় ওঁর অপরিসীম আত্মিক ক্ষমতা আছে। গ্রামে গ্রামে ঘুরে তিনি নির্যাতিত গ্রামবাসীদের অভিযোগ শোনেন। লক্ষ্য করা যাচ্ছে, দিনে দিনে তিনি সেইসব অনপড় মানুষগুলোর চোখে স্বর্গরাজ্যের একটা স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার বিশ্বাস উৎপন্ন করছেন।)

এখানে কয়েকটি কথা লক্ষ্য করতে হবে। যাঁর উল্লেখ করা হচ্ছে তিনি মিস্টার গান্ধী, 'মহাত্মা' হননি তখনো। ব্যারিস্টার, কিন্তু বিশ্ববিখ্যাত নন। তবু শত্রুপক্ষের সেই এস.ডি.ও. সাহেবের কলমে একটা ভয়তাড়িত সম্ভ্রম মিশ্রিত হয়েছে। এস.ডি.ও. সাহেবের মনশ্চক্ষে কি ভেসে উঠেছিল সিনাই পর্বতে অমনি এক নাঙ্গা ফকিরের পদচারণা? দু-হাজার বছর আগে একইভাবে তিনি স্বর্গরাজ্যের ছবি নিরন্ন ইহুদিদের সামনে তুলে ধরতেন নাকি? 'Millennium' শব্দটির প্রয়োগে ঐ খ্রিস্টান অফিসারের মানসিক অবস্থাটা বোঝা যায়। সরল অর্থে 'মিলেনিয়াম' হচ্ছে সহস্র বৎসরের সমাহার। কিন্তু গূঢ় অর্থে 'মিলেনিয়াম' বাইবেল বর্ণিত একটি তত্ত্বকথাও! বাইবেল বলছেন : লোকান্তরিত যিশু আবার এই মর্তভূমিতে ফিরে আসবেন—মর্তে স্বর্গের প্রতিষ্ঠা করতে! শয়তান ও তার অনুচরদের 'কুইট ওয়ার্ল্ড' অনুশাসন শোনাতে! তাকেও বলে millennium। ফলে, আজ থেকে আশি বছর আগে রচিত সেই খ্রিস্টান শাসকের গোপন রিপোর্টটির মর্মার্থ ভাল করে বুঝে নেওয়া দরকার। লোকটা বিচক্ষণ। তাই ভয় পেয়েছে! গান্ধীজির চম্পারন অভিযানের একটি কাহিনী আমি আমার কৈশোরে বাবার সংগৃহীত তথ্য থেকে জেনেছিলাম। ঘটনাটার কোনো ঐতিহাসিক সমর্থন পাইনি। না গান্ধীজির আত্মজীবনীতে, না তাঁর জীবনীকারদের জবানীতে। তবে বয়ঃসন্ধিকালে আমার পিতৃদেবের একটি বাঁধানো খাতায় (খাতাটার নাম : 'সঞ্চয়'—তাতে পেপার কাটিং রাখা থাকত) একটা কাগজের কাটিং আঠা দিয়ে সাঁটা ছিল। বাবামশাই সেই খাতাটা আমাদের দেখতে দিতেন না। তাঁর দেরাজে বন্ধ থাকত।

কেন—তা তখন বুঝিনি। তাঁর প্রয়াণের পরে আজ বুঝতে পারি। ওই খাতায় হেনরি হ্যাভলক এলিস বা সিগমন্ড ফ্রয়েডের প্রবন্ধের কাটিংও থাকত—যা তিনি আমাদের বয়ঃসন্ধিকালে পড়তে দিতে রাজি ছিলেন না। তাছাড়া কোনো কোনো পেপার কাটিং-এর মাথায় লাল কালির ঢেড়াচিহ্ন থাকত। তখন বুঝিনি আজ বুঝতে পারি। সেগুলি প্রেসক্রাইবড্ সাহিত্য। সেই রকম ঢেড়াচিহ্ন মার্কা একটা পেপার কাটিং-এ প্রবন্ধটি পড়েছিলাম বাবার স্বর্গারোহণের পরে। আমি তখন কলেজের ছাত্র। সম্ভবত কাহিনীটি পাটনা, দিল্লি বা কলকাতার কোনো ইংরেজী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে রচনাটি বাজেয়াপ্ত হয়। পিতৃদেব তাই সেটি ঢেড়াচিহ্ন দিয়ে খাতায় সেঁটে রেখেছিলেন। স্মৃতি থেকে মন্থন করে যতটুকু উদ্ধার করতে পারি স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর এই উৎসব মুখরিত পরিবেশে তা আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে উপভোগ করা যাক।

গান্ধীজি, সমকালীন সেই প্রবন্ধকারের মতে, চম্পারন অভিযানে এসেছিলেন দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে। প্রথমত, সরেজমিন তদন্ত : ব্রিটিশ নীল ব্যবসায়ীরা নিরক্ষর গ্রামবাসীদের ওপর সত্যই কতটা অত্যাচার করছে। দ্বিতীয়ত, তাঁর অহিংস অসহযোগ অস্ত্রটা বাস্তবে কতটা কার্যকরী হয়েছে বা হতে পারে তা যাচাই করতে।

একটি গ্রামে গিয়ে গান্ধীজি শুনলেন পাকা রাস্তা দিয়ে গো-গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাবার অধিকার গ্রাম্য চাষীদের নেই। পাকা সড়কটা শুধু সাহেবদের জন্য। কালা আদমিদের যেতে হবে চষাখেতের ওপর দিয়ে। গান্ধীজি তৎক্ষণাৎ অভিযোগটার সত্যাসত্য বিচার করতে বসলেন। সবাই সনির্বন্ধ অনুরোধ করল, এমন হঠকারিতা করবেন না। গান্ধীজি আদৌ কর্ণপাত করলেন না। গরুর গাড়িতে উঠে বসলেন পাঁচনবাড়ি হাতে। খালি গা, খালি পা, মাথায় ঈ-য়া পগ্ন। হ্যাট-হ্যাট করে রওনা দিলেন পাকা সড়কের ওপর দিয়ে।

যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়—একটু পরে দেখা গেল উল্টোদিক থেকে ঘোড়ায় চেপে এগিয়ে আসছে এক লালমুখো সাহেব। বাস্তবে জেলার পুলিস সুপারিন্টেন্ডেন্ট। কালা আদমিটার দুঃসাহস দেখে আপাদমস্তক তার জ্বলে গেল। কোনো কথা নয়, এক লাফে নেমে এল ঘোড়ার পিঠ থেকে। এলোপাথাড়ি চালাতে থাকে তার চাবুকটা—ডাইনে—বাঁয়ে। নগ্ন ফকির নির্বাক। গো-গাড়িতে বসে বসে চাবুকের মার খাচ্ছেন। শুধু দুটি হাত দিয়ে ঢেকে রেখেছেন চোখজোড়া। তখনো তাঁর চোখে চশমা ওঠেনি। খানিক পরে সাহেবই ক্লান্ত হয়ে থেমে যায়। বেশ একটু অবাকও হয় সে, ব্যাপার কী? লোকটা গাড়ি-গরু ফেলে রেখে মাঠ ভেঙে ছুটে পালাচ্ছে না কেন? অথবা কেন ওর ব্রিচেস পরা ঠ্যাঙজোড়া জড়িয়ে ধরে মাফি মাঙছে না? সাহেব থামতেই গাড়োয়ান চোখ থেকে তার হাতদুটো সরায়। চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করে,

Are you satisfied? তোমার তৃপ্তি হয়েছে?

সাহেব যেন ভূতের মুখে রামনাম শুনল! নাকি রামের মুখে ভূতের ভাষা? উদাম গা ওই গো-গাড়ির গাড়োয়ান নিগারটা পরিষ্কার ইংরেজিতে কথা বলবে এ ছিল তার দুঃস্বপ্নের অগোচর। বললে, বাট্ ... বাট্ ... হু আর য়ু ...

গাড়োয়ানটি বললে—আই প্রিজিউম, আই হ্যাভ দ্য প্রিভিলেজ অব এ চান্স-মিটিং উইথ মিস্টার কক্স, দ্য এস. পি. অব্ চম্পারন।

সাহেবের চোয়ালের লোয়ার ম্যান্ডেব্‌ল্‌টা ঝুলে পড়েছে। কথা ফোটে না তার মুখে। গাড়োয়ান তার রক্তাক্ত হাতখানা করমর্দনের জন্য বাড়িয়ে দিয়ে বলে, দিস ইজ এম. কে. গান্ধী, বার-অ্যাট-ল!

কাহিনীটা কতদূর বাস্তব তথ্যনির্ভর তা বলতে পারব না। তবে গান্ধীজি চম্পারন ত্যাগ করে যাবার আগে পাকা রাস্তায় নিগারদের পদব্রজে ও গো-গাড়ি চালিয়ে যাবার অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল—এটা ঐতিহাসিক তথ্য আর গান্ধীজি চম্পারন ছেড়ে যাবার তিন মাসের মধ্যে ভারতবর্ষে নীল চাষ বন্ধ হয়ে যায়।

এসব কথায় কিন্তু চম্পারন-অভিযাত্রার মূল্যায়ন হবে না। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে—যে ইতিহাস রমেশচন্দ্রকে লিখতে দেওয়া হল না—সেই ইতিহাসে চম্পারন একটা চিহ্নিত ক্রান্তিকাল! ভারত স্বাধীন হয়েছে নানান নেতৃবৃন্দের নানান পন্থায়—মঙ্গল পাণ্ডে থেকে চাপেকার ব্রাদার্স, ক্ষুদিরাম থেকে ভগৎ সিং, রাসবিহারী থেকে সুভাষচন্দ্র—নানান সংগ্রামীর নানান সৈনাপত্য। তার মধ্যে ওই অর্ধনগ্ন ফকিরটিরও আছে একটি মুখ্যভূমিকা। তাঁর অস্ত্র ছিল : অহিংস অসহযোগ। চম্পারনে সেই অস্ত্রটির প্রথম প্রয়োগ হয়েছিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সে কথা ভুলে যেতে পারে, নিরন্ন ভারতবাসী কোনোদিন সে কথা ভুলবে না।

দুই : অবহেলিত সমুদ্রোপকূল : দাণ্ডী, গুজরাট : ১৯৩০

দাণ্ডী পদযাত্রা বা 'দাণ্ডী মার্চ' ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের আর একটি চিহ্নিত খণ্ডকাল। তের দিন আগেপিছে ভারতের দুই প্রান্তে ঘটে গেল দুটি যুগান্তকারী ঘটনা। পাঁচই এপ্রিল দাণ্ডী সমুদ্রতটে গান্ধীজি লবণ-আইন ভঙ্গ করে কারাবরণ করলেন; আর তার তেরোদিন পরে মাস্টারদা, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল, প্রীতিলতা প্রভৃতি অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত একদল স্বাধীনতা সংগ্রামী চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করলেন। ক্রমে হলেন শহীদ।

সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবে সেসব অবান্তর কথা কেই-বা মনে রেখেছে? ১৯৩০ সালের ছাব্বিশে জানুয়ারী কংগ্রেস শপথ নিল পূর্ণ স্বাধীনতার। নতুন সংগ্রাম পদ্ধতি হিসেবে কোনো একটা সরকারি আইন ভেঙে কারাবরণ করতে হবে। গান্ধীজি এ বিষয়ে এক বিচিত্র প্রস্তাব দিলেন। তিনি বড়লাটকে চিঠি লিখে জানালেন যে, এপ্রিলের পাঁচ তারিখে তিনি দাণ্ডীগ্রামে সমুদ্রোপকূলে লবণ-আইন ভঙ্গ করবেন। 'লবণ-আইন'! সেটা কী? হঠাৎ লবণ-আইনই বা কেন?

তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান গান্ধীজি এমন একটা আইন বেছে নিলেন যাতে ধনী-দরিদ্র জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যক্ষভাবে সবাই উৎপীড়িত হচ্ছে। লবণ এমন একটা জিনিস যা জল-বাতাসের মতো মানুষমাত্রেরই নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং যা প্রকৃতিতে সহজলভ্য ঈশ্বরের কৃপায়। অথচ ব্রিটিশ সরকার আইন জারি করে রেখেছে যে সমুদ্র উপকূলের সাধারণ গ্রামবাসী সমুদ্রের জল শুকিয়ে নিজ প্রয়োজনেও নুন বানাতে পারবে না। গ্রামের দরিদ্রতম ভিক্ষুককে ল্যাঙ্কাশয়ার থেকে আমদানি করা লবণ কিনে খেতে হবে। এখানে তৈরি করলে নুনের সেরপ্রতি যত দাম হত তার সাতগুণ দাম সেই বিলেতী নুনের!

গান্ধীজি ওয়ার্কিং কমিটিকে জানালেন যে, তিনি তাঁর সবরমতী আশ্রমের আটাত্তরজন আশ্রমবাসীকে নিয়ে পদব্রজে রওনা দেবেন—দাণ্ডীগ্রামে গিয়ে লবণ আইন ভঙ্গ করতে। দাণ্ডী একটি নগণ্য গ্রাম। সবরমতী থেকে গান্ধীজি নির্বাচিত পথে তার দূরত্ব ৩৮৮ কি.মি. (প্রায় ২৩২ মাইল)। গ্রামবাসীর সংখ্যা হাজারেরও কম।

কংগ্রেসের অনেক ভূগোল-বিশারদ পণ্ডিত হাঁ হাঁ করে উঠলেন—পায়ে হেঁটে যাবার কী দরকার? অন্তত গো-গাড়িতে গেলে তিন কুড়ি পাড়ি দেওয়া বৃদ্ধ ভদ্রলোক একটু আরাম পাবেন। তাছাড়া সবরমতী তীর বরাবর হাঁটলে সমুদ্রের দূরত্ব অনেক অনেক কম—শতখানেক মাইল হয় কি না হয়। উনি এভাবে ঘুরিয়ে বামহস্তে দক্ষিণ কর্ণ দেখাতে চাইছেন কেন?

গান্ধীজি কারও কথায় কর্ণপাত করলেন না। খবরটা জানালেন বড়লাটকে—তিনি বারোই মার্চ আহমেদাবাদ থেকে পদব্রজে রওনা হবেন। চব্বিশ দিন পরে দাণ্ডী গ্রাম প্রান্তে উপনীত হয়ে পাঁচই এপ্রিল স্বহস্তে লবণ-আইন ভঙ্গ করবেন। বড়লাট বাহাদুর যেন শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার যথাযথ ব্যবস্থা রাখেন। এ যেন অনেকটা সেই রঘু ডাকাতের চিঠি পাঠিয়ে ডাকাতি করার মতো ব্যাপার।

গান্ধীজির পরিকল্পনাটির কার্যকারিতা বোঝা গেল ক্রমে। মহাত্মাজি জানতেন মহাভারতের পকেট এডিশন হয় না। এতবড় কর্মযজ্ঞের ব্যাপক প্রচার চাইলে তিন-চারশো কিলোমিটার পথ হাঁটতে হবেই। দেশ-বিদেশের সাংবাদিক ও আলোকচিত্র শিল্পীরা সমবেত হন—দ্বিচক্র অথবা চতুশ্চক্রযানে। এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে গান্ধীজি তেইশ দিন সময় নিয়েছিলেন। অর্থাৎ দৈনিক প্রায় ১৬ কি.মি. (দশ মাইল) হাঁটতে হয়েছে তাঁকে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় যে গ্রামে উপনীত হয়েছেন সেখানে প্রার্থনা সভায় গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষাংশে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণটুকু সকলের সঙ্গে আবৃত্তি করেছেন। 'স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা' থেকে 'ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি' পর্যন্ত। তারপর সমবেত অনপড় গ্রামবাসীদের বলেছেন প্রায় একই কথা—"সমুদ্রে লবণ সঞ্চিত করেছেন রামজি অথবা আল্লাহতালা, আলো-বাতাস-জল তিনি যেমন দিয়েছেন মানুষকে। এর কোনো কিছুই 'বার্তানিয়ার' মানুষের দান নয়। 'অংরেজ' আমাদের দেশটা দখল করার আগেও সাগরে লবণ ছিল, আমরা এতদিন বড় দরিয়ার পানি সূর্যের আলোয় শুকিয়ে নিয়ে লবণ তৈরি করেছি, আজও করব। রামজি ঔর খোদাতালা আমাদের সহায়।"

চব্বিশ দিন ধরে সারা পৃথিবী রুদ্ধনিশ্বাসে প্রহর গুণেছিল। একদিকে ব্রিটিশ সরকার, যার রাজ্যে সূর্য পর্যন্ত অস্ত যাবার সাহস পায় না, অন্যদিকে একজন একষট্টি বছরের যষ্টিসম্বল বৃদ্ধ! যে যষ্টি শুধু ভারসাম্য রক্ষার জন্য। আক্রমণ দূর অস্ত, আত্মরক্ষার জন্যও নয়।

পাঁচই এপ্রিল সন্ধ্যায় তিনি সবরমতী গ্রামে এসে পৌছলেন। সান্ধ্য-উপাসনার পরে গ্রামবাসীদের আহ্বান জানালেন। পরদিন প্রাতে প্রার্থনাসভা সেরে একসঙ্গে লবণ-আইন ভঙ্গ করতে হবে। সেদিন দাণ্ডীগ্রাম লোকে লোকারণ্য।

পরদিন সকালে সমুদ্রতীরে কাতারে কাতারে মানুষ। তার সঙ্গে লাঠিধারী পুলিসবাহিনী আর ক্যামেরাধারী বিদেশী সাংবাদিক।

গান্ধীজি জগৎপিতাকে প্রণাম জানিয়ে নীচু হয়ে একমুঠো লবণাক্ত মৃত্তিকা তুলে নিলেন। ভারতবর্ষ পুকার দিয়ে উঠল : মহাত্মা গান্ধী কী জয়!

সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল যষ্টিবর্ষণ। লোকজন ভয়ে পালিয়ে গেল না। দাঁড়িয়ে মার খেল। পুলিস গ্রেপ্তার করল সপার্ষদ গান্ধীজিকে।

সুভাষচন্দ্র তার আগেই (তেইশে জানুয়ারি তাঁর শুভ জন্মদিনে) গ্রেপ্তার হয়েছেন। সর্দার প্যাটেলও জেলের ভিতর। সরোজিনী নাইডু গ্রেপ্তার হলেন গান্ধীজির সঙ্গেই। জওহারলাল তখন অন্যত্র। গান্ধীজি হাজতে বসে নির্বাক চরকা ঘোরাতে বসলেন। পুলিসের বড়কর্তা আপত্তি করল না।

আড়াই হাজার বছর আগে সারনাথ মৃগদাবে একবার এক মহাত্মা ধর্মচক্র প্রবর্তন করেছিলেন। তার প্রভাব সমকাল অনুভব করতে পারেনি। গান্ধীজির সেই সমুদ্রতট থেকে একমুঠো লবণাক্ত মৃত্তিকা উঠিয়ে নেওয়ায় অথবা নিরীহ চরকার প্রবর্তনে যে কী প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করবে তা সেদিন বোঝা যায়নি।

নন্দলালের আলেখ্য আর দেবীপ্রসাদের ভাস্কর্য ছাড়া স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবে দাণ্ডী পদযাত্রার যা কিছু স্মৃতি তা জমে আছে আমাদের মতো বৃদ্ধবৃদ্ধার স্মৃতিতে। আমার বয়স তখন ছয়-সাত—মহাত্মাজি গ্রেপ্তার হওয়ায় বাবার নির্দেশে আমাদের বাড়ি সেদিন অরন্ধন পালিত হয়েছিল। বাড়িসুদ্ধ কেউ কিছু আহার করিনি এটুকুই শুধু মনে আছে। আর মনে আছে সেদিন সন্ধ্যায় বাবার সঙ্গে আমরা সবাই গান্ধীজির আশু মুক্তির কামনায় প্রার্থনা করেছিলাম।

সাংবাদিক শ্রীহালাঙ্কার স্বাধীনতা-সুবর্ণজয়ন্তীর প্রাক্কালে গান্ধীজির পদচিহ্ন রেখা ধরে ঐ তেইশটি গ্রাম ঘুরে দেখে এসেছেন। তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে কিছুটা অনুবাদ করে শোনাই :

'দাণ্ডীগ্রাম থেকে সমুদ্র এক কিলোমিটার সরে গেছে। মহাত্মাজি যে ভূখণ্ডে একমুঠো লবণাক্ত মাটি তুলে নিয়েছিলেন সেখানে একটি কংক্রিটের স্মৃতিচিহ্ন আছে। তাকে ঘিরে একটা নীচু পাঁচিল। স্মৃতিচিহ্নে কী যেন লেখা আছে, এখন আর ঠিক পাঠোদ্ধার করা যায় না। প্রাচীরটা স্থানে স্থানে ভেঙে গেছে। তবে তার ব্যবহার আছে। জায়গাটা জনমানব বর্জিত বলে গ্রামের মানুষ ওই পাঁচিলের ওপর অতি প্রত্যূষে উঠে সমুদ্রের দিকে পিছন ফিরে বসে। পুরীষত্যাগের জৈবিক প্রয়োজনে। কর্দমাক্ত জমিটায় জোয়ারের জলও আসে না। তবে বৃষ্টির জলে সব মালিন্য একদিন ধুয়ে মুছে যায়। যেভাবে মুছে গেছে মহাত্মাজির স্মৃতি। কোনো যাত্রী বা দর্শনার্থী দুর্গন্ধে ও দিগরে যায় না।'

বিগত আদমসুমারি মতে দাণ্ডীগ্রামে ১৯৯০-এ লোকসংখ্যা প্রায় বারশো। তারা কেউ স্বহস্তে লবণ প্রস্তুত করে না। প্রয়োজন হয় না। বাজারে টাটা কোম্পানির লবণই আপাতত সবাই ব্যবহার করে। স্বাধীন ভারতে মুদ্রিত একাধিক ম্যাপ বইতে (১ সে.মি. = ২৫ কি.মি. বড় ম্যাপেও) তন্ন-তন্ন করে খুঁজেও আমি দাণ্ডী বা Dandi

নামটি উদ্ধার করতে পারিনি। গ্রামটা খাম্বাত উপসাগরে। নিকটতম শহর হচ্ছে নবসারি (পশ্য, মানচিত্রে আমি আন্দাজিক্যালি দাণ্ডীকে ম্যাপে দেখিয়েছি অবশ্য।) INDIA TODAY-র পরবর্তী একটি সংখ্যায় ওই গ্রামের কাছাকাছি সুদৃশ্য স্মারকচিহ্নের একটি আলোকচিত্র দেখেছি। ঠিক জানি না, সেটা কোথায় অবস্থিত। বোধ করি, নিকটতম শহর নবসারিতে।

লবণ-আইন ভঙ্গ করা আজ ইতিহাস। কিন্তু নিছক ইতিহাসের কি কিছু মূল্য নেই? টাটা কোম্পানির সহজলভ্য ডব্‌ল-রিফাইন্ড সল্ট বাজারে পাওয়া যায় বলেই দাণ্ডী অভিযান তার ঐতিহাসিক মর্যাদাকে হারিয়ে ফেলবে? গান্ধীজি যে তেইশটি গ্রামে পর-পর রাত্রিবাস করেছিলেন সেই সেই গ্রাম, সেই সেই কক্ষে তেইশটি স্মারক-প্রস্তর স্থাপন করতে কত খরচ পড়ত? ইন্দিরা গান্ধী এবং তাঁর পিতৃদেবের চিতাভস্ম চার্টার্ড প্লেনে করে ভারতের বিভিন্ন নদ-নদীতে নিক্ষেপ করতে যত খরচ হয়েছিল তার দশকোটি ভাগের একভাগ খরচে তেইশটি কাঠের ফলক বানানো যেত। যেত না? তফাৎ তো এটুকুই যে, গান্ধীজি কোনও 'ডায়নাস্টিক রুল' প্রতিষ্ঠা করতে চাননি। গান্ধীজি চীনযুদ্ধের চরম পরাজয়ের গ্লানি থেকে মুক্ত হয়ে গদি আঁকড়ে থাকার ঐকান্তিকতায় কৃষ্ণ মেননকে পদত্যাগে বাধ্য করতে পারতেন না; তাই না? গান্ধীজি একনায়কতন্ত্র ধরে রাখতে জয়প্রকাশ নারায়ণের মতো সাচ্চা দেশপ্রেমীকে জেলে পুরতে পারতেন না। তাই তো? তাই দাণ্ডী অভিযান আজ মৃত, বিস্মৃত।

যে গৃহে বাহাত্তর বছর আগে এক এক রাত গান্ধীজি কাটিয়েছিলেন, সাংবাদিক তার সবগুলি শনাক্ত করতে পারেননি। কী অপরিসীম দুঃখের কথা! কী করা যাবে? কোনো চিহ্ন না থাকলে ছয়-সাত দশক অতীতের কথা বলবার মতো মানুষ কী করে গ্রামে খুঁজে পাওয়া যাবে? তবু দু-চারজনকে উদ্ধার করেছিলেন সাংবাদিক তাঁর অপরিসীম নিষ্ঠায়।

আম্নালি একটি অতি নগণ্য গ্রাম। কোনো ধনবান গুজরাতি মহাজন বহু বছর আগে সেখানে রামজির নামে একটি ধরম্‌শালা বানিয়েছিলেন। 'সিরেফ পুন্ হোবে' এই আশায়। সেখানে একরাত কাটিয়ে গিয়েছিলেন গান্ধীজি। ধরম্‌শালার স্বর্গত রক্ষক গান্ধীজির নিরাপত্তা বিধানের জন্য তাঁর তেরো বছরের বালকটিকে বলেছিলেন সেই মেহ্‌মানের শয়নকক্ষের সামনে পাহারা দিতে। ত্রয়োদশবর্ষীয় বালক আজ অশীতিপর বৃদ্ধ। তাঁর স্পষ্ট মনে আছে সেই রাতটার কথা। পিতাজি বলেছিলেন— বহ্ মহাত্মা হ্যয়, দেওতা হ্যয়। তু সারি রাত জাগ্‌তে রহ্!

মহাত্মা বা দেবতার কী জাতীয় বিপদ হতে পারে তা মালুম হয়নি ত্রয়োদশবর্ষীয় চুনিভাই প্যাটেলের। 'লেকিন' সে 'তামাম রাত' পাহারা দিয়েছিল। ফাগুন-চৈত্র

মাস। যথেষ্ট গরম। গান্ধীজি ঘরের দরজা খুলেই শুয়েছিলেন। তাই চুনিভাই সজাগ হয়ে বসেছিলেন। লাঠি হাতে। নিবু-নিবু হারিকেন নিয়ে। ওঁর ধারণা হয়েছিল সেই একটি রাতের জন্য গান্ধীমহারাজের জীবন তাঁরই সতর্কতার ওপর নির্ভর করছে। আশি বছরের জীবনে সেই একটা রাতের কথা প্যাটেল ভুলতে পারেননি। মনে আছে, গান্ধীজি মাঝরাত্রে একবার উঠে প্রকৃতির আহ্বানে বাইরে গিয়েছিলেন। চুনিভাই তড়াক করে লাফিয়ে উঠে সঙ্গ নিয়েছিলেন। গান্ধীজি অবাক হয়ে গুজরাটি ভাষায় বলেছিলেন—তুই বেহুদ্দো জেগে বসে আছিস কেন রে? যা শুয়ে পড়গে যা।
চুনিভাই তখন 'দুর্গেশ দুমরাজ'। একদিকেপিতাজির আদেশ, অন্যদিকে মহাত্মাজির! কিন্তু বিবেক নির্দেশে তিনি ক্যাসাবিয়াঙ্কার ভূমিকাটাই পালন করেছিলেন—সারাটা রাত পাহারা দিয়ে।
সেই চুনিভাই প্যাটেল আজও বহাল তবিয়ৎ। অশীতিপর বৃদ্ধকে সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন নুন তৈরি করার প্রয়োজন আর নেই; কিন্তু স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে এ গ্রামে কোনো গ্রামোদ্যোগের প্রচেষ্টা সার্থকতা লাভ করেনি, গান্ধীজির আদর্শে?
বৃদ্ধ বলেছিলেন—কেন করবে না ভাইসাব? মহাত্মাজি বলে গিয়েছিলেন, স্বয়ম্ভর হতে, ছোট ছোট কুটির শিল্প গড়ে তুলতে। তাই তুলেছি আমরা। ঘরে ঘরে কুটিরশিল্প। বাইরের কোনো পুঁজি আমরা গ্রহণই করি না।
—কী শিল্প? তাঁত?
—জি নেহি, চোলাই!
আম্নালি গাঁয়ে একটাই কুটিরশিল্প। ঘরে ঘরে চোলাই মদের উৎপাদন। নগদ টাকা দিয়ে পার্টি মস্তানেরা পাঁইট পাঁইট মদ কিনে নিয়ে যায়। চুনাও ঘোষিত হলে ব্যবসার রবরবা। তবে, ক্যা আফশোস কি বাতেঁ। চুনাও ছমাস অন্তর হয় না।

★ ★ ★

পদযাত্রাপথে আর একটি নগণ্য গ্রাম 'বোরিয়াভি'। এখানেও গান্ধীজি একরাত্রি কাটিয়ে যান। স্থানীয় একটি ধর্মশালায়। সঙ্গে বদরুদ্দিন তায়েবজি; পাশের ঘরে সরোজিনী নাইডু। সাংবাদিকের উদ্দেশ্য শুনে গাঁয়ের কয়েকজন বৃদ্ধ মাতব্বর সেই বিশেষ কক্ষটি খুলে দেখালে—খুপরি ঘর। নুড়িয়া টালির ছাদ। পাশাপাশি দুটি নেয়ারের খাটিয়া। পিছন দিকে কঞ্চির জাফরিকাটা একহাত বাই একহাত এক-চিল্‌তে জানলা। বর্তমান রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালদের দারোয়ানের শয়নকক্ষের সঙ্গেও কিছুটা প্রভেদ আছে বটে। কোনো গান্ধীভক্ত এখানে ধর্মশালার প্রবেশপথে নিজব্যয়ে একটি মর্মর ফলক বসিয়েছিলেন প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে। তাতে লেখা দাণ্ডীযাত্রা পথে মহাত্মাজি এই ধর্মশালায় একরাত্রি বাস করে যান। গুজরাতী লিপ্যক্ষর, সাংবাদিক পড়তে পারেননি,

মাতব্বরেরা পাঠোদ্ধার করে দিলেন। পাঠোদ্ধারের আগে সেটাকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করার প্রয়োজন হয়েছিল অবশ্য।

ঠিক পাশেই আর একটি প্রস্তরফলক। এটি বয়সে নবীন বলে মনে হল। বেশ ঝকঝকে। তাতে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া আছে : ধর্মশালাটি শুধুমাত্র বর্ণহিন্দুদের বসবাসের জন্য, বিধর্মী অথবা হরিজনদের প্রবেশাধিকার নেই। অর্থাৎ বদরুদ্দিন তায়েবজি ফিরে এলে আজ আর সেই ঘরে রাত্রিবাস করতে পারবেন না। দেশটা ইতিমধ্যে স্বাধীন হয়ে গেছে যে!

বোরিয়াভির পরের স্টেশন আঙ্কেলেশ্বর। সে আমলে ছিল একটি গণ্ডগ্রাম। বর্তমানে ফোর-লেন পিচমোড়া সড়কে ক্রমাগত ষোলো চাকার ট্রাক ছোটাছুটি করছে। শহরের একান্তে দৈত্যাকার কেমিক্যাল ফ্যাক্টরি। পথশ্রান্ত গান্ধীজি যেভাবে এখানে বুকভরে নিশ্বাস নিয়েছিলেন সেভাবে আজ আর শ্বাস নেওয়া যায় না। বাতাসে কার্বন মনোক্সাইড, সালফার, এইচ-টু-এস-এর দুর্গন্ধ। হেতু একই : দেশটা স্বাধীন!

পরবর্তী বিশ্রাম দাভান গ্রামে। এখানে আটাত্তরজন আশ্রমিক সেবাব্রতীকে নিয়ে গান্ধীজি কোথায় কেমন করে রাত কাটিয়েছিলেন 'দাভান'-এর মনে নেই। গ্রামবৃদ্ধদের দেখা পায়নি সাংবাদিক। নওজোয়ানরা অবাক হল—তাই নাকি! বাপুজি এ গাঁয়ে একরাত ছিলেন! তাজ্জব কী বাত! আমরা তো জানিই না।

ওপাশ থেকে ধমকে উঠেছিল আলাভাই ভওয়াভাই, মাঝবয়সী একজন বর্ধিষ্ণু বাসিন্দা : তোমরা কেমন করে জানবে হে? এ তো আর অমিতাভ বচ্চনের কথা হচ্ছে না, রেখা বা শ্রীদেবীর কথাও না। গান্ধী মহারাজের নামটুকু যে শুনেছ এই তাঁর ভাগ্য।

সাংবাদিক জানতে চান, আপনি জানেন? উনি কোথায় রাতটা কাটিয়েছিলেন?

—জি হাঁ, জানতা হুঁ! আপ আইয়ে মেরে ঘরপে। লেকিন শুনিয়ে ভাইসাব—ম্যয় অচ্ছুত হুঁ!

সাংবাদিক জানালেন, তিনি জাতপাত মানেন না।

—তব মেহেরবানি করকে মেরে সাথ আইয়ে।

আলাভাই ভওয়াভাই রীতিমত সম্পন্ন গাঁওয়ার। তাঁর গোশালায় না হোক পঞ্চাশটা গাই গরু। দুর্ভাগ্যবশত তিনি প্রথমত আনপড়, দ্বিতীয়ত 'ভারওয়াজ' শ্রেণীর, অর্থাৎ অচ্ছুৎ। তাই গ্রামে অন্তেবাসী। বর্ণহিন্দুদের এলাকার বাইরে। সবচেয়ে দুঃখের কথা তিনি 'জল অচল' হওয়ায় তাঁর গরুর বাঁটের দুধও অস্পৃশ্য হয়ে গেছে। যাবে না? ওঁর বউ-মেয়ে-পুত্রবধূর হাতে কাটা বিচালি খায় যে দুর্ভাগিনী গোমাতার দল! এজন্য স্থানীয় 'দুগ্ধসংগ্রহকারী সমবায় প্রতিষ্ঠান', যারা বাড়ি বাড়ি দুধ সংগ্রহ করে

'আনন্দ' কারখানায় চালান দেয় ('মন্থন' ছায়াছবিটা দেখেছেন?) সেই কোঅপারেটিভ সোসাইটি আলাভাইকে সদস্য করে নিতে অস্বীকার করেছে। আলাভাই সাংবাদিককে বলেছিলেন,—"কী বলব বাবুজি! ওদের কোঅপারেটিভে আটশোজন সদস্য। তার মধ্যে একশো আটানব্বইজনের গাই-গরু আছে, বাকি ছয়শো দুজনের এক-একটা এঁড়ে বাছুরও নেই। তবে তারা সবাই বর্ণহিন্দু! তারা রাজনৈতিক নেতাদের ধরপাকড় করে, একে ওকে 'এথি' খাইয়ে কোঅপারেটিভের সভ্য হয়েছে। শেয়ার কিনেছে, লাভের অংশ পায়। আর দেখুন আমার পঞ্চাশটা গাই-গরু আছে। তবু আমাকে ওরা সভ্য করবে না। কেন? কারণ আমি হরিজন। আমি অচ্ছুৎ।"

সাংবাদিক কিছু সান্ত্বনা দিতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তার আগেই আলাভাইয়ের কিশোরী কন্যাটি অন্দরমহল থেকে বার হয়ে এসে দেহাতি হিন্দিতে বললে—পিতাজিকে আপনি একটু বুঝিয়ে বলুন তো, বাবুজি! ঘুষ দিয়ে সভ্য হওয়ার চেয়ে ঘুষ না দিয়ে অসভ্য থাকাটা ভাল নয় কি?

সাংবাদিকের মনে পড়ে গেল 'মন্থন' ছায়াছবির পাঁচ দশক আগে তৈরি আর একটি চলচ্চিত্রের কথা। দেবিকারাণী অভিনীত 'অচ্ছুৎকন্যা'।

শৈলেশ প্যাটেল ওই গ্রামের একজন ধনী দুগ্ধ-ব্যবসায়ী। বর্ণহিন্দু। দুগ্ধ কোঅপারেটিভ-এর সেক্রেটারি, তার বাড়ির সামনে সারি দেওয়া ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। 'আনন্দ' ফ্যাক্টরির দিকে এবার যাত্রা শুরু করবে। পাঁচ আঙুলে পাঁচটি গ্রহবারণ রত্নাঙ্গুরীয় ধারণ করে এবং মেদমৈনাক তনুদেহখানি নিয়ে তিনি ঝুলায় বসে দোল ও ঘোল খেতে খেতে বলছিলেন 'শুনিয়ে বাবুজি। গাঁধি মহারাজ যে বছর আসেন সেই বছর আমার দাদাজির মাত্র তিনটি গাই গরু ছিল। আমার দিদাজি ভোর ভোর উঠে গোয়ালে গোবর কুড়াতে যেতেন। ঐ দেওয়ালে ঘুঁটে দিতেন। শুধু দুধ বেচে সে আমলে সংসার চালানো যেত না। তাই দিদা মাথায় করে ঘর ঘর ঘুঁটে বেচে আসতেন। তখনো আমার জন্মই হয়নি।'

সাংবাদিক সমরবাবু জানতে চেয়েছিলেন—আপনার দিদা কি মহাত্মাজিকে স্বচক্ষে দেখেছিলেন?

—জী হ্যাঁ! একসাথ প্রার্থনা ভি কী থী।

—তাঁরা কি ...

—জী হ্যাঁ, দাদাজি তো গুজর গ্যায়া। লেকিন দিদা জিন্দা হ্যঁয়!

না, এ গাঁয়ে নেই। আছেন শৈলেশ প্যাটেলজির পুত্রের কাছে। নিউ জার্সিতে। কী উন্নতি! গান্ধীজির আমলে যিনি মাথায় করে ঘুঁটে ফিরি করতেন আজ সেই স্বাধীন ভারতের সন্তান নিউ জার্সির এয়ার কন্ডিশন বাড়িতে বাস করছেন।

★ ★ ★

যে আটাত্তরজন সত্যাগ্রহী আশ্রমবাসীকে নিয়ে মহাত্মাজি সাতষট্টি বছর আগে দাণ্ডীগ্রামে লবণ-আইন ভঙ্গ করতে গিয়েছিলেন তার ভিতর সাতাত্তরজন হয় স্বর্গে, নয় বেহেস্তে অথবা 'হেভেন'-এ চলে গেছেন। সাংবাদিক খুঁজে খুঁজে হারাধনের ঊনআশিতম পুত্রটিকে আবিষ্কার করেন এই গ্রামেই। তার নাম ভানুশঙ্কর দাভে। বয়স বিরানব্বই। দু-হাত দূরত্বে যে দুনিয়া তা মুছে গেছে তাঁর দৃষ্টি থেকে। 'ছানি' নয় বার্ধক্যজনিত অমোঘ দৃষ্টিহীনতা। সাংবাদিক সমর হালরঙ্করের দুখানি হাত বলিরেখাঙ্কিত শীর্ণ দু-হাতে তুলে নিয়ে তিনি বলেছিলেন,—"না, না, সমর ভাই! আমি তোমার সঙ্গে একমত নই! আজ ভারতের সিংহাসন নিয়ে এক ঝাঁক খ্যাঁকশেয়াল কামড়া-কামড়ি করছে বলেই আমি মেনে নিতে রাজি নই যে, সব শেষ হয়ে গেছে। আমরা তো আজও মরিনি! আমরা আবার ওই শেয়ালগুলোকে তাড়িয়ে পশুরাজ সিংহকেই সিংহাসনে বসাব। পারব না বলছ?

বিরানব্বই বছর বয়সের সত্যাগ্রহীর ওই 'তরুণের স্বপ্নটা' নিয়ে সাংবাদিক কোনো বিতর্কে জড়িয়ে পড়েননি।

তিন : ঋর্ণা দিদিভাইয়ের নোয়াখালি। বাঙলাদেশ ১৯৪৬

চম্পারন বিহারে। রাজ্যটা বোধ করি প্রশাসনিক দুর্বৃত্তায়নে বর্তমান ভারতে রেকর্ড স্থানের অধিকারী। গান্ধীজির আদর্শ সেখানে সম্পূর্ণ অদৃশ্য। তাঁকে দেখা যায় শুধু একশো টাকার ছাপানো নোটে। যখন রাজনৈতিক পাটোয়ারিরা অনুগত মস্তানদের টাকার বান্ডিল হাতফিরি করেন। আর মহাত্মাজির জন্মভূমি গুজরাট? সেই জাতির পিতার সূর্যালোক থেকে প্লুটোর দূরত্বে কলকারখানা জাতপাত ভোগলালসার চূড়ান্ত নিদর্শন। তিন নম্বর পদযাত্রার যে কথা লিখতে বসেছি তা খণ্ডিত বৃহত্তর ভারতের এক প্রত্যন্ত দেশের কথা। নোয়াখালি। বর্তমানে বাঙলাদেশে। স্বদেশে আজ গান্ধীজি অবজ্ঞাত; কিন্তু নোয়াখালির একটি প্রত্যন্ত গ্রামে তিনি সজীব। তাঁকে যারা বাঁচিয়ে রেখেছে তাদের সম্বন্ধে 'হিন্দু না ওরা মুসলিম' এ প্রশ্নটাই ওঠেনি।

প্রসঙ্গত মনে পড়ছে গান্ধীজির সপ্ততিতম জন্মদিনে ১৯৩৯ সালে অধ্যাপক আইনস্টাইনের শ্রদ্ধার্ঘ্যটির কথা। পরে সেই রচনাটি অধ্যাপক আইনস্টাইন রচিত 'Out of My Later Years'(N.Y. 1950) গ্রন্থে সংকলিত। আইনস্টাইন লিখেছিলেন—

> "রাজনীতির ইতিহাসে গান্ধী একমেবাদ্বিতীয়ম্। নিপীড়িত মানুষের জন্য তিনি আবিষ্কার করলেন একটি সম্পূর্ণ নতুন মানবিক পদ্ধতি। অপরিসীম উদ্যোগ আর নিষ্ঠায় দেখালেন তার প্রয়োগ-কৌশল।
>
> "এই জননায়ক কোনোদিন কোনও বহির্বন্ধুর সাহায্য প্রার্থনা করেননি। তিনি রাজনীতিবিদ্; অথচ তাঁর সাফল্যের বনিয়াদে নেই কোনো কপটতা অথবা কারিগরি কৌশল। চরিত্রবলই তার একমাত্র হাতিয়ার।
>
> হিংসার প্রতি তাঁর আন্তরিক অশ্রদ্ধা। তাঁর চরিত্র-উপাদানে প্রজ্ঞা ও বিনয়ের সহাবস্থান। সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা আর দুর্মদ বিশ্বাস সম্বল করে তিনি স্বদেশবাসীর আত্মিক ও পার্থিব উন্নতিবিধানে নিয়োগ করেছিলেন সর্বশক্তি। রুখে দাঁড়িয়েছিলেন ইউরোপের পাশবিকতার বিরুদ্ধে।
>
> "হয়তো আগামী প্রজন্ম বিশ্বাসই করতে চাইবে না যে এমন একজন রক্তমাংসে গড়া মরমানুষ একদিন পৃথিবীতে হেঁটে-চলে বেড়াতেন। আমাদের সৌভাগ্য, নিয়তির কাছে আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত যে, এমন একজন মহাদীপ্তিমানের সঙ্গে আমরা একই কালে দুনিয়াদারি করে গেলাম—এমন একজন মানুষ যিনি অনাগত অযুত প্রজন্মের কাছে আলোকবর্তিকারূপে প্রতিভাত হতে থাকবেন।"

কী যেন বলছিলাম? হ্যাঁ, দেশে যিনি বিস্মৃত, বিদেশে—নোয়াখালিতে—আজ কেউ তাঁকে মনে করে রেখেছে কি না। তথ্যটা যাচাই করতে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বৎসরে নোয়াখালিতে গিয়েছিলেন সাংবাদিক সুদীপ চক্রবর্তী। কিন্তু তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গে আসার আগে পটভূমির একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া প্রয়োজন। নোয়াখালি-দাঙ্গার পশ্চাদপট :

নোয়াখালিতে দাঙ্গাটা হয়েছিল স্বাধীনতালাভের পূর্ববৎসর—অক্টোবর ১৯৪৬-এ। সন্ধ্যার দীপাবলীর বর্ণনার আগে সকালবেলাকার সলতে পাকানোর ইতিকথাটা নাকি বলতে হয়। তেমনি নোয়াখালির ঘরে-ঘরে আগুন দেবার কথা বলার আগে কলকাতায় মনুমেন্টের তলায় সুরাবর্দির বক্তৃতাটারও কথা প্রাসঙ্গিক।

ষোলোই আগস্ট, ১৯৪৬, মনুমেন্টের নিচে দাঁড়িয়ে সংযুক্ত বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী শহীদ সুরাবর্দি যখন 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' হুঙ্কার ছাড়ছেন, তখন তাঁর গোপন নির্দেশে ও ব্যবস্থাপনায় একদল মুসলমান গুণ্ডা কলকাতার একাংশে একের পর এক হিন্দুর দোকান-বাড়ি লুট করে চলেছিল। মুখ্যমন্ত্রীর গোপন মদত থাকায় দাঙ্গাবাজরা নির্ভীক। আরক্ষা বাহিনী কুম্ভকর্ণ। দুদিন পরে ১৮.৮.৪৬ তারিখে The Statesman পত্রিকায় ছাপা হল : "Over 270 killed, 1,600 injured in two days in Calcutta (Report on the direct action of the Muslim League)।" খবরের কাগজে ছাপা হয়নি, কিন্তু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় জানি, ওই সংখ্যা দুটির পঁচানব্বই ভাগ হিন্দুর। এ তথ্যটা জানিয়ে গেছেন দুজন বিদেশী সাংবাদিক, যাঁরা না হিন্দু, না মুসলমান। প্রথমজন লেওনার্ড মোস্‌লে (Last Days of the British Raj) এবং দ্বিতীয়জন মাইকেল এডওয়ার্ডস (Last Years of British India)। তাঁরা পরিষ্কার ভাষায় লিখে গেছেন যে, মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দির গোপন নির্দেশে পুলিস গুণ্ডাদের কোনো বাধা দেয়নি।

কিন্তু এর পরেই চাকা ঘুরে গেল। সারা বাঙলায় যাই হোক, কলকাতা শহরে হিন্দুরা যথেষ্ট পরিমাণে সংখ্যাগরিষ্ঠ। তিন দিনের ভিতর হিন্দুরা ঘুরে দাঁড়াল। আত্মরক্ষা নয়, আক্রমণ। মুসলমান অধ্যুষিত ঘন বসতিতে। তৎক্ষণাৎ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সক্রিয় হল পুলিস ও প্রশাসন। শুরু হল ধরপাকড়। বোধ করি বাকি কয়দিনে পাল্লা প্রায় সমান সমান হয়ে গেল। তা যাক না যাক সুরাবর্দির ওই হঠকারিতায় বিহার ও যুক্তপ্রদেশে অনেক নিরীহ মুসলমান গ্রামবাসী হিন্দু গুণ্ডাদের প্রতিশোধস্পৃহার শিকার হল। 'দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং'-এর পক্ষকাল পরে দোসরা সেপ্টেম্বর গান্ধীজি তাঁর হরিজন পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লিখেছিলেন—

> 'কলকাতার সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক হানাহানিতে লজ্জায় আমার মাথা নীচু হয়ে গিয়েছে। এজন্য দায়ী কলকাতা শহরের সমস্ত নাগরিক। তাঁদের প্রচ্ছন্ন সমর্থন না থাকলে গুণ্ডার দল কখনও এই ব্যাপক হিংস্র সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড সঙ্ঘটিত করতে পারত না।'

সেই সময় কলকাতাবাসী কয়েকজন কংগ্রেস নেতা ও কর্মী গান্ধীজির কাছে নির্দেশ নিতে যান, কীভাবে গুণ্ডাদের মোকাবিলা করা যাবে। গান্ধীজি তাদের বলেন,—'আমার কাছে এসেছ কেন? কলকাতার ট্রাম-শ্রমিকদের কাছে যাও। তাদের দেখে শেখো : কীভাবে দাঙ্গার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো যায়।'

এই প্রসঙ্গে সহপাঠী অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের একটি প্রবন্ধ থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিই। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী দিবসে একটি কলকাতায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের ক্রোড়পত্রে রচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল :

> 'এই প্রজন্মের কজন তরুণ-তরুণী জানেন (কমিউনিস্ট তরুণ-তরুণীসহ) যে, ১৯৪৬-এর ষোলো, সতেরো এবং আঠারোই আগস্টের, সেই হিংস্র সাম্প্রদায়িকতার দিনগুলিতে রাজাবাজার, পার্কসার্কাস, বেলগাছিয়া এবং বালিগঞ্জ ট্রাম-ডিপোর কয়েকশত হিন্দু-মুসলমান ট্রাম-শ্রমিক, লালঝাণ্ডা হাতে রক্ষা করেছিলেন হাজার-হাজার হিন্দু-মুসলমান নরনারীর প্রাণ। প্রতিহত করেছিলেন গুণ্ডাদের সশস্ত্র শক্তিকে। কজন মনে রাখে আজ সেইসব বীর সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী ট্রাম-শ্রমিকদের—চতুর আলি, রেজ্জাক, জাহিরুল হক, কেতননারায়ণ মিশির, কালী ব্যানার্জী বা পাঁড়েজিকে? এই প্রবন্ধ লেখকের বয়স তখন তেইশ—কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্রকর্মী—সেইসব অবিস্মরণীয় দৃশ্য স্মৃতিতে আজও জীবন্ত হয়ে আছে।'

অধ্যপক গৌতম চট্টোপাধ্যায় একজন সাচ্চা দেশপ্রেমিক। সাম্যবাদী, সে আমার সহাধ্যায়ী। আমরা দুজন একই কলেজে, একই বছরে, একই শ্রেণীতে পড়েছি। তফাৎ এই ওর অনার্স ছিল ইতিহাসে, আমার গণিতে। যে ঘটনা বর্ণনা করেছে গৌতম, তা আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। এই প্রবন্ধ-লেখকের বয়সও তখন তেইশ, সেও ছিল ছাত্রকর্মী। যদিও লালঝাণ্ডার বাহক নয়। গৌতম একবার লিখেছে :

> তারপর অর্ধশতাব্দী কেটে গেছে। নতুন করে ধর্মীয় মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িক তাণ্ডব দেখা দিয়েছে ভারতে, পাকিস্তানে, আফগানিস্তানে, বিশ্বের বহু দেশে। ভারতের একাধিক রাজ্যের মন্ত্রিসভায় আসীন হয়েছে আধা-ফ্যাসিস্ট

সাম্প্রদায়িক উগ্র হিন্দুত্বের পতাকাবাহী অশুভ শক্তিরা। স্বাধীনতা-সংগ্রামের শেষপর্বে ও দেশভাগের কালে সাম্প্রদায়িক তাণ্ডবের বিরুদ্ধে গান্ধীজির অকুতোভয় উদ্যমের পাশাপাশি লড়েছিলেন সেযুগের কমিউনিস্টরা—কলকাতার ট্রাম-শ্রমিক ও ছাত্ররা, হাসনাবাদের কৃষকেরা। শহীদ হয়েছিলেন মুক্ত বিপ্লবী কমিউনিস্ট লালমোহন সেন। ১৯৯৭-এর এই স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীকালে তার থেকে কোনো অর্থবহ শিক্ষা কি গ্রহণ করতে পারব না সবাই?

অধ্যাপক কমরেড গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের ওই মর্মস্পর্শী প্রবন্ধের বাণী আদ্যন্ত সত্য—নির্মম সত্য; কিন্তু 'নাথিং বাট দ্য ট্রুথ' কী? এই বেদনাদায়ক প্রশ্নটি কেন মনে জাগছে তা বলি।

আমার প্রশ্নটা : উনিশশো ছেচল্লিশ-সাতচল্লিশের কলকাতা-দাঙ্গার সেই মানবিক বর্ণনায় কেন আমরা খুঁজে পেলাম না আরও কয়েকটি মৃত্যুঞ্জয়ী সত্যাশ্রয়ী শহীদের নাম : স্মৃতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীল দাশগুপ্ত অথবা শচীন মিত্রের নাম? কী তাঁদের অপরাধ? একটা অপরাধই তো নজরে পড়ছে—মৃত্যুবরণ করার সময়, স্বীকার্য, তাঁদের হাতে লালঝাণ্ডা ছিল না, ছিল তেরঙা পতাকা! সেই জন্যেই কি কমরেড গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে আজও জীবন্ত হয়ে আছে শুধু কমরেড লালমোহন সেনের নাম?

শচীন্দ্রনাথ মিত্রকে (জন্ম : ১৯০৯) কলেজ থেকে বহিষ্কৃত করা হয়। অপরাধ : সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে তিনি বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। ১৯৪৩-এ প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের তিনি প্রধান উপদেষ্টা ও প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। তিনি ছিলেন পুরোপুরি অহিংসবাদী, গান্ধীর আদর্শে বিশ্বাসী।

সেই অবিস্মরণীয় সাতচল্লিশ সালের পয়লা সেপ্টেম্বর—সেই যখন কমরেড গৌতম চট্টোপাধ্যায় এবং অধম লেখকের বয়স ছিল বাইশ-তেইশ, সেদিন স্থির হয়েছিল কংগ্রেসী ও কমিউনিস্ট ছাত্ররা মিলিতভাবে একটি শান্তিকামী প্রদর্শনী করবেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে হিন্দু-মুসলমান শিল্পীছাত্ররা—লালঝাণ্ডা ও তেরঙা ঝাণ্ডাধারী ছাত্ররা মিলিতভাবে চিত্র প্রদর্শনীর মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির দিকটা তুলে ধরার চেষ্টা করেছিল। জয়নাল আবেদিন (মুসলমান), খালেদ চৌধুরী (হিন্দু) প্রভৃতি প্রখ্যাত চিত্রশিল্পীদের মধ্যে এই নগণ্য ছাত্রশিল্পীর চিত্রও সেখানে সাজানো ছিল। কথা ছিল পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল স্বয়ং আসবেন ঐ প্রদর্শনী উদ্বোধন করতে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অন্যতম কর্মসূচীতে। কিন্তু কোনো কোনো মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় হঠাৎ আবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সেদিন সকাল থেকেই শুরু হয়ে

যায়। ফলে, জাতীয় প্রদর্শনীর উদ্বোধন স্থগিত রাখতে বাধ্য হল ছাত্ররা—শান্তিকামী হিন্দু ও মুসলমান ছাত্ররা। তারা একটি সম্মিলিত শান্তিমিছিল বার করে। এই মিছিল যখন সার্কুলার রোড আর পার্ক স্ট্রিটের কাছাকাছি পৌঁছলো—মল্লিকবাজার এলাকায়—তখন কয়েকজন স্থানীয় কুখ্যাত সাম্প্রদায়িক গুণ্ডা ওই ছাত্র মিছিলকে আক্রমণ করে। তারা ছিল সশস্ত্র। ছাত্ররা নিরস্ত্র। হাতে শুধু তেরঙা অথবা লাল ঝাণ্ডা। বাধা দিতে এগিয়ে যান শচীন্দ্রনাথ। বেমক্কা ছুরিকাহত হন। আটচল্লিশ ঘণ্টা বেঁচেছিলেন তিনি। মারা যান তেসরা।

ওই তেসরা সেপ্টেম্বর শচীন্দ্রনাথের মরদেহ তেরঙা পতাকায় ঢেকে, ফুলে-ফুলে সাজিয়ে একটি শোকযাত্রায় সামিল হয় ছাত্ররা। হাসপাতাল থেকে শ্মশান—শোকযাত্রায় যারা পদব্রজে চলেছে তারা অধিকাংশই কংগ্রেস ও কম্যুনিস্ট হিন্দু ছাত্র; কিন্তু বেশ কিছু অসাম্প্রদায়িক মুসলমান ছাত্রও ছিল সে মিছিলে। পুলিস ছিল কি না মনে নেই। এই শোকযাত্রার ওপরেও পেশাদারি গুণ্ডার দল হামলা করে। দুজন কংগ্রেসী ছাত্র ছুরিকাহত হন। একজন অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত. সুশীল দাশগুপ্ত। মেদিনীপুর জেল থেকে পালিয়ে এসে ছাত্র আন্দোলনের কাজ করছিলেন। ঘটনাস্থলেই তিনি শহীদ হয়ে যান। দ্বিতীয়, উত্তরপাড়ার স্মৃতীশ বন্দ্যোপাধ্যায় (জন্ম ১৯১০)। জাতীয় প্রদর্শনীর মূল হোতা। প্রথমে কমিউনিস্ট কর্মী ছিলেন। ১৯৪০ সাল নাগাদ মতবিরোধ হওয়ায় কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে কংগ্রেসে যোগ দেন। ছুরিকাহত স্মৃতীশকে হাসপাতাল নিয়ে আসা হয়। সেখানে একই দিনে স্মৃতীশ শহীদ হয়ে যান। সেই তেসরা তারিখ! তিনজনকে একই সঙ্গে দাহ করা হয়।

প্রসঙ্গত আমার নিজের পূর্বপ্রকাশিত রচনা থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিতে হচ্ছে : দাঙ্গা প্রশমিত করতে মহাত্মা গান্ধীর প্রচেষ্টা অবিস্মরণীয়। প্রথম দিকে বাধা পেলেও পরবর্তীকালে তাঁকে সাহায্য করতে আপামর জনসাধারণ এগিয়ে এসেছিলেন। মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে অগ্রসর হয়ে আসেন— কী হিন্দু, কী মুসলমান, কী কংগ্রেস, কী কমিউনিস্ট। শহীদ হয়েছিলেন স্মৃতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন মিত্র, লালমোহন সেন এবং ননী সেন। ঐ সময় কলকাতা শহরের ট্রাম-শ্রমিক ইউনিয়ন ছিল বামপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির কব্জায়। যাঁরা সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী কাজ করতে এগিয়ে এসেছিলেন তাঁরা ছিলেন সাচ্চা সাম্যবাদী—মহম্মদ ইসমাইল, সোমনাথ লাহিড়ী, আব্দুল রেজ্জাক, সত্যনারায়ণ মিশির, জহরুক হক, ধীরেন মজুমদার। কে হিন্দু, কে মুসলমান চেনা যায়নি। সবাই সাম্যবাদী। তাঁরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পথে নেমেছিলেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অজুহাতে ট্রামগাড়ি চালানো তাঁরা বন্ধ হতে দেননি (এক-দুই-তিন ...)

অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায় পশ্চিমবাংলার বাইরে আধা-ফ্যাসিস্ট অশুভ কিছু সরকারের কথা বলেছেন। ঘরের ভিতর পুরো ফ্যাসিস্ট কোনো সরকারের অপকীর্তি কি নজরে পড়ে না তাঁর? আনন্দবাজারে (১৪.১২.১৯৯২) আশিস ঘোষ অনেক দুঃখে লিখেছিলেন—

> 'বামফ্রন্ট শাসিত এই রাজ্যের রাজধানীতে টানা সাতদিন পরিকল্পিত তাণ্ডবের মুখে দাঁড়িয়ে (ডিসেম্বর ১৯৯২) প্রতিরোধের লেশমাত্র চোখে পড়ল না এখন। কার্ফু, ফৌজি-টহল, আর পুলিশবাহিনীর উপর আস্থা রেখে বামফ্রন্ট সরকারকে দাঙ্গার মোকাবিলা করতে দেখা গেল।... কথায় কথায় ক্যাডার নামানোর যে হুমকি শোনা যায়, সেই ক্যাডাররাই বা গেলেন কোথায়? ... আজ ট্যাংরা, তিলজলা শ্রমিক এলাকা হচ্ছে বামপন্থীদের শক্ত ঘাঁটি। শ্রমিক সংগঠনই নয়, দল হিসাবেও এখানে বামপন্থীদের কব্জা মজবুত। অথচ কদিন আগে বিবিবাগান জ্বলতে দেখে বাধা দেবার মতো আজ কোনো একজন রেজ্জাক কিংবা সত্যনারায়ণকে দেখতে পাওয়া যায়নি।'

কী আর বলা যাবে? বলতে গেলে তো সেই জমিদারপুত্র বুর্জোয়া কবির অনবদ্য পংক্তিটা আবার শোনাতে হয় :

> 'ওরে ভাই, কার নিন্দা কর তুমি? মাথা কর নত,
> এ আমার এ তোমার পাপ।'

তোমার-আমার কথা থাক। সেই বিস্মৃত বৃদ্ধের প্রসঙ্গেই ফেরা যাক।

★ ★ ★

কিন্তু তার আগে আর একটা প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে যেতে মন সরছে না। একটা বিচিত্র ঐতিহাসিক ঘটনা।

জনাব হোসেন শহীদ সুরাবর্দী অন্তর থেকে আশা করেছিলেন যে, 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে'-তে সরকারি ক্ষমতাবলে তিনি যদি কলকাতায় কাফের নিধনযজ্ঞে সফলকাম হতে পারেন তাহলেই তিনি মুসলমানদের ভিতর জনপ্রিয়তম নেতা হয়ে উঠবেন। তার অর্থ : ভৌগোলিকভাবে ভারত ত্রিখণ্ডিত হয়ে গেলে পূর্ব-পাকিস্তানের মসনদে তাঁর নিরঙ্কুশ অধিকার বর্তাবে। তখন তাঁর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিসেল খাজা নাজিমুদ্দিন। পূর্ববৎসরই নাজিমুদ্দিনকে মুসলিম লীগের পরিষদীয় দলের নির্বাচনে সুরাবর্দী হারিয়ে দিয়েছেন। ফলে ভারত বিভক্ত হলেই পূর্ব-বাংলার গদি তাঁর কব্জায়। বাস্তবে তা হল না কিন্তু।

পূর্ব পাকিস্তান পয়দা হওয়ার মাত্র হপ্তাখানেক আগে মুসলিম লীগ পরিষদীয় দলের আবার নির্বাচন হল। খাজা নাজিমুদ্দিন, যাঁর জামানত বাজেয়াপ্ত হবার কথা—নির্বাচনে জয়লাভ করলেন। শহীদ সুরাবর্দী হেরে ভূত! কী বলবেন একে? জনগণেশের প্রচণ্ড কৌতুক? মহাকালের ন্যায়নিষ্ঠ বিচার? আজ্ঞে না। আমি মনে করি আল্লাহতালার গজব।

প্রথম কথা—ইসলাম বলে না : বিধর্মীকে হত্যা করা পুণ্য কাজ। দ্বিতীয় কথা—নির্বাচনে যাঁরা ভোট দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে হয়তো অনেকেই ছিলেন অসাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন। তৃতীয় কথা—ভোটদাতাদের অনেকের নিকটআত্মীয়, বন্ধু হয়তো দাঙ্গার শেষ পর্যায়ে হিন্দুদের হাতে নিহত হয়েছেন। সুরাবর্দী দায়ী?

হেতু যাই হোক, সুরাবর্দীর অবস্থা এমন হল যে, তিনি ঢাকায় পালিয়ে যেতেও সাহস পেলেন না। লজ্জার মাথা খেয়ে বেলেঘাটায় ঐ কাফেরটির কাছে আত্মসমর্পণ করে প্রাণ বাঁচালেন। গান্ধীজি শরণাগতকে আশ্রয় দিলেন। আর শুধু সেই কারণেই প্রথম দিকে কলকাতাবাসীর কাছে অপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে স্বদেশবাসীর কাছে এমন গণ-তিরস্কার বোধ হয় গান্ধীজি জীবনে শোনেননি। ওঁর জীবনীকার অধ্যপক নির্মলকুমার লিখেছেন—'ঐ সময় একা বসে থাকলে মহাত্মাজি আপনমনে শুধু বিড়বিড় করতেন, 'ম্যয় ক্যা করুঁ? ম্যয় ক্যা করুঁ?'

উনিশশো ছেচল্লিশ সালের সাতই নভেম্বর গান্ধীজি যাত্রা করলেন নোয়াখালির উদ্দেশ্যে। যাবার আগে নেহরুকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—"My inner voice tells me : You may not live to be a witness to this senseless slaughter. If people refuse to see what is clear as daylight and pay no heed to what you say, does it not mean that your day is over?" [আমার বিবেক আমাকে নির্দেশ দিচ্ছে : এই অর্থহীন গণহত্যা দেখার জন্য তোমার বেঁচে থাকার কোনো মানে হয় না! যে সত্যটা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট তা যদি লোকে দেখেও দেখতে না পাওয়ার ভান করে, তোমার কথায় কেউ যদি কান না দেয়, তাহলে কি বুঝতে হবে না যে, তোমার দিন ফুরিয়েছে?]

★ ★ ★

দীর্ঘ চার মাস ধরে পদব্রজে ভ্রমণ করলেন নোয়াখালি জেলায়। সর্বসমেত উনপঞ্চাশটি গ্রাম। লুই ফিশার-এর 'গান্ধী' থেকে কিছু উদ্ধৃতি অনুবাদ করে শোনাই—

> কর্দমাক্ত পথে নগ্নপদে হেঁটে চলেছেন গান্ধীজি, তাঁর দুই পায়ে ফোস্কা। প্রথম দিকে শতকরা আশিজন মুসলমান গ্রামবাসীই গান্ধীজিকে গালমন্দ করেছেন। ...গান্ধীজি অবিশ্রান্তভাবে বলে যেতেন 'হিন্দু আর মুসলমান একই ঈশ্বর বা

আল্লাহ্‌র সন্তান। তারা ভাই-ভাই।' এইভাবে ক্রমে তিনি ঐ অঞ্চলের বিশ-পঁচিশ লক্ষ অধিবাসীর অন্তর জয় করলেন। নোয়াখালির বিস্তৃত অঞ্চলে আবার ফিরে এল শান্তি ও সম্প্রীতি। গান্ধীজি কোনো সশস্ত্র রক্ষী নিতে অস্বীকার করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে পায়ে হেঁটে গ্রাম থেকে গ্রামে শান্তিপ্রচার করতে যেতেন দশ-পনেরোজন আদর্শবাদী নারী ও পুরুষকর্মী। সে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা।

উনিশশো ছেচল্লিশ সালের পাঁচই ডিসেম্বর নোয়াখালি থেকে একটি বিবৃতিতে গান্ধীজি বলেছিলেন,—'আমার স্কন্ধে এখন একটা প্রচণ্ড দায়িত্ব। আমার জীবনের সবচেয়ে জটিল ও সবচেয়ে কঠিন দায়িত্ব! আমার সেই মন্ত্রটা আজ এখানেই পরীক্ষিত হবে : 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'। হয় হিন্দু ও মুসলমানেরা এখানে শান্তি ও সম্প্রীতিতে পুনরায় বসবাস করতে সম্মত হবে, অথবা এই উদ্দেশ্যসাধন করতে গিয়ে আমি আত্মবলিদান দেব।'

তাই দিয়েছিলেন তিনি। আরও দুবছর পরে।

উনিশশো সাতচল্লিশ সালের আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে ফিরে এলেন দাঙ্গা-বিধ্বস্ত কলকাতায়। বেলেঘাটা অঞ্চলে দাঙ্গায় পোড়া একটা বাড়িতে এসে উঠলেন তিনি। তখনও ভারত স্বাধীন হয়নি। পাকিস্তান সৃষ্টি হয়নি। আতঙ্কতাড়িত শহীদ সুরাবর্দি এসে আশ্রয় নিলেন গান্ধীজির ছত্রছায়ায়। প্রথম কয়েকদিন কিছু ধর্মান্ধ এসে গান্ধীজিকে গালমন্দ করল। যে আপ্যায়ন পেয়েছিলেন নোয়াখালিতে মুসলমানদের কাছে, তারই ধর্মান্তরিত রূপান্তর! তাঁকে লক্ষ্য করে সবাই ইট-পাটকেলও ছুঁড়ল। এবারেও গান্ধীজি দেহরক্ষী বা পুলিসের সাহায্য নিতে অস্বীকার করলেন। ইষ্টকবর্ষণের মাঝখানেই খোলা বারান্দায় বেরিয়ে এসে যুক্তকরে জনতাকে সম্বোধন করে বললেন—

ঈশ্বর-আল্লাহ্‌ তেরে নাম। সবকো সম্মতি দে ভগবান।

জনতা—তার চোদ্দ আনা কাফের, দু-আনা নেড়ে—সেকথার জবাবে ওই দোতলার বারান্দা লক্ষ্য করে দনাদ্দন ইট-পাথর ছুঁড়তে থাকে। গান্ধীজির হিতাকাঙ্ক্ষীরা তাঁকে জোর করে বারান্দা থেকে ঘরের ভিতর নিয়ে যান। গান্ধীজি আবার বসে যান চরকা কাটতে : তব ম্যয় ক্যা করুঁ?

নিষ্প্রভাত রাত্রি হয় না। এই 'গন্ধা সিটি'র বাসিন্দাদের অন্তর-গভীরে তিল-তিল করে পরিবর্তন শুরু হয়ে গেল। এই মিছিল নগরীর পাঁকেই যে পদ্ম হয়ে ফুটে উঠেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুভাষচন্দ্র, মুজতবা আলিরা। স্বাধীনতার পূর্বদিন সন্ধ্যায় এল পুনর্মিলনের ভাদ্রের ভরাকোটাল। হাজার হাজার হিন্দু আর মুসলমান—

হয়তো যাদের অতি নিকট আত্মীয় সাম্প্রতিক দাঙ্গায় প্রাণ দিয়েছে—হয়তো তাদের কবরটা ইট বাঁধিয়ে দেওয়া বাকি, অথবা গয়ায় গিয়ে পিণ্ডদানের কাজটা—তারা হা হা করা কান্নায় ভেঙে পড়ল। বুকে জড়িয়ে ধরল পরস্পরকে—এ কী কাণ্ড হয়ে গেল করিম ভাই ? এ কী করলেন তোমাদের আল্লাহ্‌তালা! আমার বিশ বছরের জোয়ান নাতিটা ...

—নেহি, নেহি, লছমনপ্রসাদ! রামজিকো মৎ দুষনা! ইয়ে হ্যয় তুমহারা গুনাহ্! ইয়ে হ্যয় হামারা কসুর। মেরা জওয়ান বেটা ...

মিলন-মিছিল আর মিলাদ-শরিফ। হিন্দু-মুসলমানের মিলিত স্রোত চলেছে বেলেঘাটার মহাতীর্থে। মহাত্মাজির কাছে ক্ষমা চাইতে, মাফি মাঙতে!

পরদিন পনেরোই আগস্ট ১৯৪৭! পলাশীপ্রান্তরে অস্তমিত—সেই মীরমদন আর মোহনলালের হিন্দু-মুসলমানের মিলিত রক্তে রাঙা সূর্যটা আবার দেখা দিল পুব আকাশে। ফেডারাল কোর্ট-এর বিচারপতি জাস্টিস কেনায়ার শপথবাক্য পাঠ করালেন স্বাধীন ভারতের প্রথম বড়লাটকে। না, গান্ধী নন, সুভাষ নন, তিনি ভারতীয়ই নন। লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন! প্রধানমন্ত্রী মতিলাল তনয়ের নেতৃত্বে দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসের তাবড়-তাবড় নেতারা শপথ নিলেন। সে রাজসূয় যজ্ঞ খতম হলে ছয় ঘোড়ায় টানা মাথা খোলা বিরাট ব্রুহামে বড়লাট, তাঁর পত্নী আর তাঁর অধীনস্থ প্রধানমন্ত্রী দিল্লি পরিক্রমা করলেন। মধ্যাহ্নে মহাভোজের আয়োজন। মহাত্মাজি সেদিন বেলেঘাটায় অনশনরত, নেতাজি পুনরায় অন্তর্ধান করেছেন। আর জওহারলাল সপার্ষদ ত্রিশ কোর্সের ডিনার খাচ্ছেন। পাশেই লেডি মাউন্টব্যাটেন। জওহারলালের বুকে লাল গোলাপের গন্ধ ছাপিয়ে লেডির পোশাক থেকে দুর্মূল্য ফরাসী সুবাসের সৌগন্ধ্য। খিদমদগারেরা যখন মুর্গ-মসল্লম সার্ভ করেছে—প্রধানমন্ত্রী টেংরি চুষছেন—তখন নেপথ্যে শুরু হল মিঠে মিঠে এক আবহসঙ্গীত। এতদিন পরে ঠিক মনে পড়ে না। বোধ করি ওই গানটা :

মুক্তির মন্দির সোপানতলে কত প্রাণ হল বলিদান—
লেখা আছে অশ্রুজলে।

সারা ভারতে সেদিন যে কী মহোৎসব। দনাদ্দন পটকা ফাটছে। হাউই উঠে যাচ্ছে আকাশে। ঘরে ঘরে দীপাবলী। ব্যতিক্রম এই 'সিটি অব জয়'-এর একটি দাঙ্গা-বিধ্বস্ত দ্বিতলবাড়ি। নিষ্প্রদীপ সেটা। আটাত্তর বছরের এক বৃদ্ধ তরুণ সেখানে সারা দিন প্রায়োপবেশনে দিন কাটাচ্ছেন। দাঙ্গায় যারা প্রাণ দিয়েছেন তাদের আত্মার সদ্গতির জন্যেই শুধু নয়—অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার জন্য যাঁরা শহীদ হয়েছেন তাঁদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করতেও সারাদিন চরকা কাটছেন আর জপ করে চলেছেন তাঁর মন্ত্র :

ঈশ্বর আল্লাহ্ তেরে নাম
সবকো সন্মতি দে ভগবান।

ওপারের কথা কিছুটা বলি—

তেরই আগস্ট মাউন্টব্যাটেন করাচীতে পৌঁছেছিলেন। জওহারলাল লেডি মাউন্টব্যাটেনের স্বামীকে স্বাধীন ভারতের প্রথম বড়লাটরূপে মেনে নিতে রাজি হয়েছিলেন। মহম্মদ আলি জিন্না তা হননি। তাই মাউন্টব্যাটেন করাচীতে পৌঁছে মিঃ জিন্নাকে পাকিস্তানের প্রথম বড়লাটরূপে অভিষিক্ত করলেন। পাকিস্তান গণপরিষদ জিন্নাকে একটি নতুন খেতাব দিল : 'কায়েদ-এ-আজম', অর্থাৎ 'মহান নেতা'।

জিন্না গণপরিষদে তাঁর প্রথম ভাষণে বললেন—

> "দীর্ঘদিন সংগ্রাম করে মুসলমানরা ইংরেজদের হাত থেকে একটা নিজস্ব 'হোমল্যান্ড' ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে। এখন তারা একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের অধিবাসী। এরপর আর তাঁরা নিজেদের হিন্দু বা মুসলমানরূপে গণ্য করবেন না—একই রাষ্ট্রের নাগরিক এই চিন্তাধারায় তাঁরা উদ্বুদ্ধ হবেন। ধর্ম হচ্ছে নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার।"

পাকিস্তানে অবস্থিত সংখ্যালঘু হিন্দুদের সম্বোধন করে সদ্য গদিতে-উঠে-বসা বড়লাট বাহাদুর বললেন :

> "আপনাদের ধর্ম, সংস্কৃতি, ভাষা, সমাজজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনাদের ব্যক্তিগত, পরিবারগত ও সম্প্রদায়গত স্বাধীনতা আপনারা এই পবিত্র পাকিস্তানে রক্ষা করতে পারবেন।"

মজার কথা : শিবঠাকুরের আপনদেশের কায়েদ-এ-আজমকে সেই গণপরিষদে এ প্রশ্নটা কেউ করেননি : হুজুর! আপনি আজ গদিতে চড়ে বসে পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের যে কথা বলেছেন, সেই কথাটাই তো হেইপারের এক নাঙ্গা ফকির সারাটা জীবনভর বলে এসেছেন অখণ্ড ভারতবর্ষের সংখ্যালঘুদের উদ্দেশ্যে! তখন আপনি তাতে কর্ণপাত করেননি কেন? ওই মখমল আঁটা কামদার গদিটার লোভে?

★ ★ ★

সুদীপ চক্রবর্তী, সাংবাদিক, ভারতের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর প্রাক্কালে গিয়েছিলেন নোয়াখালিতে। তিনি স্বচক্ষে দেখে আসতে চেয়েছিলেন এই সুদীর্ঘ পাঁচ দশক পাড়ি দেবার পরেও সেদেশে কেউ কি মনে রেখেছে খাটো খদ্দরের ধুতি পরা, যষ্টি-সর্বস্ব বৃদ্ধ এক পদযাত্রীকে। তাঁর ইংরেজি প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল India Today-এ স্বাধীনতা সংখ্যায়। প্রবন্ধের শিরোনাম The Past is Persent (অতীত যেখানে বর্তমান)।

আশ্চর্য! কী অপরিসীম আশ্চর্য! বিহারের চম্পারন সেই বুড়োটাকে বেমালুম ভুলে গেছে। স্বদেশে পূজ্যতে ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রিস্য ঘরওয়ালি। নাঙ্গা ফকিরকে মনে রাখেনি বিহার অথবা গুজরাত। কিন্তু এককালে যা ছিল অখণ্ড-ভারতের পূর্বপ্রান্ত, পরে পূর্ব-পাকিস্তান, শেষমেশ বাংলাদেশ ...সেই নোয়াখালি ভোলেনি ওই ঈশ্বরবিশ্বাসী সত্যাশ্রয়ীকে। অতীত যেখানে বর্তমান! মহাত্মাজি যেখান থেকে নোয়াখালির ঊনপঞ্চাশটি গ্রামে পরিক্রমা শুরু করেন সেই হেডকোয়াটার্সে সে আমলে নির্মিত হয়েছিল একটি আশ্রয়-শিবির। হিন্দু নরনারীর মাথাগোঁজার ঠাঁই ১৯৪৬ সালে। গান্ধীজির অবস্থানকালে। সদ্য-বিধবা, অনাথ শিশু, সদ্য-সন্তানহারা বৃদ্ধ-বৃদ্ধার দল, যারা প্রাণে মরেনি, খুইয়েছে সব কিছু। কিছু আগুনে, কিছু লুঠেরাদের অত্যাচারে। দত্তপাড়া আশ্রয় শিবির।

দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরে তারা হয় মরে-হেজে গেছে, অথবা উদ্‌বাস্তু হিসেবে পালিয়ে এসেছে ভারতে কিংবা প্রাণের তাগিদে বিসর্জন দিয়েছে ধর্ম। সাংবাদিক জানতে পারলেন ওদের মধ্যে বেশ কিছু মানুষ মুসলমান প্রতিবেশীদের নিরাপত্তার আশ্বাসে বিশ্বাস করে গ্রামে ফিরে গেছেন। ত্রাণ শিবিরের বিরাট জমিটা কিন্তু দাতা ফিরিয়ে নেননি। সেখানে গড়ে উঠেছে বিশাল একটা বিদ্যালয়। 'গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট' সেটা পরিচালনা করেন।

সেখানে ছাত্র-ছাত্রী দুইই আছে। তার চেয়েও বড় কথা ছাত্র-ছাত্রীদের প্রায় আধাআধি হিন্দু, আধাআধি মুসলমান।

প্রধান শিক্ষিকা হয় তো নন, তবে সাংবাদিকের মতে এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণকেন্দ্রটি : ঝর্ণাদি। ঝর্ণাধারা চৌধুরী। সাংবাদিক সুদীপ তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি মহাত্মাজিকে স্বচক্ষে দেখেছেন? ঝর্ণা হেসে গড়িয়ে পড়ে। বলে, 'দূর! আপনি যেন কী? তখনো জন্মই হয়নি আমার! তবে মহাত্মাজির কথা যদি বিস্তারিত জানতে চান আমি সঠিক লোকের সুলুক সন্ধান দিতে পারি। তিনি থাকেন শ্যামপুর গ্রামে—পীরজাদা সৈয়দ গোলাম হাসানি। শ্যামপুর বেশি দূর নয়, মাইলচারেক। ওঁর আব্বাজান পীরজাদা সারাওয়ার হুসাইনি ছিলেন সে আমলে নোয়াখালির এম.এল.এ.। অবিভক্ত বাংলার মুসলিম লীগের এক মস্ত চাঁই। এই নোয়াখালি দাঙ্গার গোটা স্কিমটাই তো...না, বাবা আমি কিছু আগবাড়িয়ে বলতে যাব না! আপনি বরং হাসানভাইয়ের কাছ যান। তাঁর কাছেই সব কিছু শুনবেন বরং।'

সুদীপ রওনা হয়ে পড়ে গান্ধীজির কায়দায় পদব্রজে। কর্দমাক্ত পথে হাঁটুতক প্যান্ট গুটিয়ে।

পীরজাদা গোলাম হাসানি তাঁর বৈঠকখানায় সাংবাদিককে আপ্যায়ন করে বসালেন। এল মুখকাটা ডাব, সত্যপীরের সিরনি।

পীরজাদা বলেন—'ঝর্ণাদি কী কইসে? গান্ধীজির বেবাক কিছ্ছা আমারে শুধাতে? খাইসে! ব্যবারডা কি হৈছে জানেন? মহাত্মাজি যখন এইহানে আয়েন তহন এই নফরডা পয়দাই হয়নি! ঝর্ণাদি সবই জানে। আঁরে লয়্যা মশকরা করে। কেউ যুদি মহাত্মাজির কতা জিগায় তহনি তাঁরে আঁয়ার ঠাঁয়ে পাঠায়ে দেয়।'

সুদীপ বলেছিল,—'আপনি কি হিন্দি অথবা ইংরেজি ভাষা ... মানে এই নোয়াখালির ভাষাটা আমি ঠিক বুঝতে পারি না।'

ঠা-ঠা করে হেসে ওঠে হাসান। বলে, —'খাইসে! কী কন? নুয়াখালির বাষা? হা রে আঁর বদনসিব! আঁই তো ব্যাব্যাক্ খিচুড়ি ভাষায় কতা কইত্যাছি! টুক ঢাহা, টুক্ নেত্রকুনা, কিছুডা বা যশোর-খুলনে।'

—'বুঝলাম। কিন্তু শুনেছি আপনার আব্বাজান ...'

—'হ হ। মান্‌তেসি! আব্বু আছিল লীগের এম্লে! অ্যাইহানে যে কাণ্ডটা হৈছে তা তেনারই কেরামতি। কিন্তুক আপনেই কয়েন বড়ভাই, আঁইর কি গুণাহ্? এ বুড়বকডা তো তহন মাইয়ার প্যাটে!'

★ ★ ★

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য গোলাম হাসানি অনেক-অনেক কিছু করেছেন। শ্রম দিয়ে সৎবুদ্ধি দিয়ে, অর্থ দিয়ে। তাঁর ঝর্ণাদির সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে। গান্ধী মেমোরিয়াল ট্রাস্টে তিনি একজন মাতব্বর।

মৌলবাদী ধর্মান্ধ শত্রুরা তো আছেই। তারা হিন্দুদের কোণঠাসা করে রাখতে চায়। যেসব কাফের ভারতে চলে গেছে, তাদের ঘরবাড়ি জমি-জেরাত ভোগদখল করছে। মুসলমান মেয়েদেরও ঘরের বাইরে যেতে দিতে চায় না। কিন্তু ঢাকার বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ঐ কাফের উচ্ছেদের ইব্‌লিশী শলাহ্য় এখন কান দেয় না। হাসানি সাংবাদিককেই সালিশ মানে। তার বিচিত্রভাষে জানতে চায় : অযোধ্যায় একদল ধর্মান্ধ মানুষ বাবরি মসজিদ ধুলিসাৎ করল বলে নোয়াখালি জেলার এই প্রত্যন্ত গ্রামে তার বদলা নেবার কোনো মানে হয়? এখানে কতকগুলো ভয়ে-থর-থর কম্পমান কাফেরের লাশ ফেলে দিলেই প্রতিশোধ নেওয়া হল? বাল ঠেকারে নাকি বলেছে এবার তার বজরঙবলী শিবসেনা নিয়ে কাশী, মথুরা আর সোমনাথের মসজিদ ভাঙতে যাবে। যায় যাক! আমরা এখানে বসে তার কী করব? সে দায় ভারতের হিন্দুদের। তারা যদি নিজেদের মঙ্গল চায় তাহলে ওই বাল ঠেকারেকে ক্ষমতাচ্যুত করে গান্ধীজির কোনো উত্তরসূরীকে ক্ষমতায় বসাবে। পারে ভাল, না পারে আমাদের কী? ধরুন যদি ভারতের হেঁদুরা বাল ঠেকারেকে ভোটের লড়াইতে না তাড়াতে পারে তাহলে আমরা কী করতে পারি? এই শ্যামপুর গাঁয়ে চৌদ্দ আনা মুসলমান।

আর টিম-টিম করছে দু-আনা হেঁদু। তারা তো সব সময়েই থরথর করে ভয়ে কাঁপছে। প্রতিবেশী মোছলমানদের ভয়ে নয়, ভারতের ওই বাল ঠেকারের ভয়ে। তার বজরঙবলীর দল যেদিন কাশী বা মথুরার মসজিদ ভাঙবে সেদিনই তো এখানে লাগবে দাঙ্গা। দাঙ্গা নয়, দাঙ্গা হয় দু তরফা। যা ভারতে হয়। এখানে তা নয়। এখানে তো শুধু একতরফা ঠ্যাঙানি! ওই চোদ্দ আনা মোছলমান জোয়ানেরা যখন দো-আনি হেঁদুবাড়ির মা-বৌ-বেটিদের ধরে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করবে তখন আপনার পবনপুত্র বাল ঠেকারে তা ঠেকাতে পারবে? আমার কথা সবাই শোনে; কিন্তু আমিও পারব না তখন। পারলে আপনারাই পারেন, বড়াভাইসাব, সে দুর্যোগ এড়াতে। বাল ঠেকারেকে রাম ঠেকান ঠেকিয়ে।

সন্ধ্যায় সুদীপ ফিরে এল আশ্রম পরিচালিত বিদ্যালয়ে। হাসানিও এল তার সঙ্গে। এই বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে—এটা অবশ্য তখন আশ্রয় শিবির ছিল—পঞ্চাশ বছর আগে মহাত্মাজি প্রতিদিন সান্ধ্য-প্রার্থনা করতেন। সেই প্রার্থনাসভা পাঁচদশক ধরে অব্যাহত চলে আসছে।

প্রশস্ত প্রাঙ্গণে বাবু হয়ে ঘাসের ওপর বসেছে সবাই। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা। একদিকে ছেলেরা—হিন্দু আর মুসলমান ঘেঁষাঘেঁষি করে; অন্যদিকে মেয়েরা—মুসলমান আর হিন্দু পাশাপাশি। মাঝখানে পতাকাদণ্ডে বাঙলাদেশের জাতীয় পতাকা। পৎপৎ করে উড়ছে সামুদ্রিক ঝড়ো হাওয়ায়।

প্রথমেই গীত হল সমবেতকণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত—'আমার সোনার বাঙলা, আমি তোমায় ভালবাসি।'

তারপর আবার বসল সবাই। পীরজাদা হোসেনভাই শুরু করলেন সেই আজব প্রার্থনা সঙ্গীত —রঘুপতি রাঘবের সেই বন্দনা গান, যা পঞ্চাশ বছর আগে এই প্রাঙ্গণে গেয়ে গেছেন মহাত্মাজি—যার শেষ দুটি পংক্তি:

ঈশ্বর আল্লাহ্ তেরে নাম।
সবকো সন্মতি দে ভগবান।

সবাই একসঙ্গে দোহার দিল। তারপর ঝর্ণাদি শুরু করলেন কুরান শরিফ থেকে সেই প্রার্থনামন্ত্রটি—যা উৎকীর্ণ করা আছে দীন-ইলাহি ধর্মের ব্যর্থ প্রবর্তক জালালউদ্দিন আকবর বাদশাহর সমাধিতে :

'দ্বানিশ্ হামেগা জুহ্ঘ্-শাদ বাদ
আজু আলম ক্বোয়াদাস আবাদ বাদ।

[প্রয়াত মহাত্মার জীবাত্মা সেই বিশ্বস্রষ্টার পরমাত্মায় বিলীন হয়ে যাক। সব মালিন্য তাঁর উপস্থিতিতে মুছে যাক। দ্যুলোক উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক।]

না! টোটাল অ্যানিহিলিয়েশন হয়নি। শুধু আমাদের মতো পক্বকেশ বৃদ্ধদের স্মৃতিতেই নন, তিনি বেঁচে আছেন প্রতিবেশী রাজ্যের গণ্ডগ্রামেও।

ফিরে দেখা : নেতাজি

এক

চোখের ওপর দেখলাম, নেতাজির জন্মশতবর্ষ অতিক্রান্ত হয়ে গেল। একশ্রেণীর মানুষ যা চেয়েছিল, ঘটল সেটাই: এই মহান উপদ্বীপের পূর্বপ্রান্তে কিছু কিছু অনুষ্ঠান হল। সারা ভারতে কোনও সাড়া জাগল না। ঠিক এটাই যাতে ঘটে সেজন্য একশ্রেণীর মানুষ পঞ্চাশ বছর ধরে সুপরিকল্পিতভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে। এক অর্থে: তারা সফল। পঞ্চাশ বছর আগে — আজাদ হিন্দ বন্দিদের যখন লালকেল্লায় বিচার হচ্ছে তখন 'নেতাজি' শব্দটা উচ্চারণমাত্র যে শিহরণ সারা ভারতের জনমানসে জেগে উঠত, আজ আর তা জাগে না। সে অর্থে ওরা সফল। এ নিয়ে অনেককে দুঃখ করতে দেখেছি। কিন্তু তাঁরা একটা কথা ভেবে দেখেন না : মানবসভ্যতায় অতি সুবিখ্যাত ব্যক্তিদের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের প্রথা আছে। সচরাচর রাষ্ট্রীয় অথবা প্রাদেশিক সরকারের মদতে মহা আড়ম্বরে তা উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। ধরুন যেভাবে উদ্‌যাপিত হয়েছিল স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহারলালের জন্মশতবার্ষিকী। নিশ্চয় মনে আছে আপনাদের। জওহার-জ্বরে আকাশবাণী ও দূরদর্শনের কর্তাব্যক্তিরা চাকরি বাঁচাতে সারাটা বছর ম্যালেরিয়া রোগীর মতো থরথর করে কেঁপেছেন। পণ্ডিতজির মতো পোশাক পরে, বুক পকেটে লাল গোলাপ গুঁজে একজন অভিনেতা দূরদর্শনের পর্দায় প্রাইমটাইমে গোটা বছর ধরে অভিনয় করে গেলেন। জওহার-দৃষ্টিতে নতুন করে আবিষ্কার করা হয়েছিল : ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া।

হয়তো একইভাবে জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হবে 'এমার্জেন্সিখ্যাত' ইন্দিরাজির, অথবা 'বোফর্সখ্যাত' তাঁর তনয়ের।

মহামানবদের জন্মশতবার্ষিকী ওভাবে পালিত হয় না। তাঁদের স্মরণসভা যদি আদৌ পালিত হয়, তবে তা অনুষ্ঠিত হয় নীরবে-নিভৃতে, গুণমুগ্ধ মানুষের চোখের জলে। কারণ তাঁরা তথাকথিত সুবিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা নন, তাঁরা মানবসভ্যতায় সহস্রাব্দী চিহ্নিত যুগাবতার।

৫৬৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে নেপালের তরাই অঞ্চলে কপিলাবস্তু নগরীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এক রাজপুত্র। বৌদ্ধসাহিত্যে কোথাও উল্লেখ নেই যে ৪৬৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তাঁর জন্মশতবার্ষিকী কোথাও পালিত হয়েছিল।

তেমনি ৪৬৯ খ্রি: পূ:-তে আবির্ভূত হয়েছিলেন বিশ্ববিশ্রুত এক গ্রিক পণ্ডিত। তাঁর জন্মশতবার্ষিকীও পালিত হয়নি ৩৬৯ খ্রি: পূর্বে। ৪ খ্রি: পূর্বাব্দে জেরুজালেমে একটি ঘোড়ার আস্তাবলে জন্ম নিয়েছিলেন আর এক মহামানব। 'প্রচত্যকে প্রচত্যকবে•

ভালবাস'—সিজারের যা প্রাপ্য তা সিজারকে মিটিয়ে দিও, কিন্তু ঈশ্বরকে যা প্রদেয় তা নিবেদন কর ঈশ্বরকেই'— এই 'বে-আইনি' উক্তি করার অপরাধে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করতে হয়েছিল। ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে যদি কেউ সেই মহামানবের উদ্দেশে দু-ফোঁটা চোখের জল ফেলে থাকে তাহলে বুড়ো ইতিহাস সেকথা লিখে রাখতে ভুলেছে। মহামানবদের ক্ষেত্রে এটাই মহাকালের নির্দেশ। প্রচলিত রীতি।

তোমাকে আমরা সমপর্যায়ের মহামানব বলে গণ্য করি, নেতাজি! তাই তোমার জন্মশতবার্ষিকী রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সাড়ম্বরে পালিত না হতে দেখে দুঃখ পেয়েছি, বিস্মিত হইনি। যারা দেশকে সত্যিকার ভালবাসে, আত্মসর্বস্ব দলীয় রাজনীতিতে আত্মবিক্রয় করেনি, তারা সেদিন তোমাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়েছে — নীরবে, নিভৃতে; সাড়ম্বরে নয়, চোখের জলে ভিজে।

এখনি যে তিনজন মহামানবের নামোল্লেখ করেছি, তাঁদের জন্মশতবার্ষিকী পালিত হয়নি সম্পূর্ণ ভিন্ন হেতুতে। মাত্র একশটি বছরে তাঁরা মানবসভ্যতায় তাঁদের প্রাপ্যস্থানটুকু লাভ করতে পারেননি। কারণ সেটা ছিল মানবসভ্যতার ঊষা যুগ। প্রথমজন ব্যাপক স্বীকৃতি পেলেন যেদিন কলিঙ্গ যুদ্ধান্তে চণ্ডাশোক রূপান্তরিত হলেন ধর্মাশোকে। দ্বিতীয়জন প্রতিষ্ঠা পেলেন তাঁর প্রিয় শিষ্য প্লেটোর গ্রন্থগুলির প্রথমে ল্যাটিনে পরে অন্যান্য য়ুরোপীয় ভাষায় অনূদিত হবার পর। একইভাবে নাজারেথের সেই মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীটি তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা লাভ করলেন অনুরক্ত ভক্তদলের কয়েক শতাব্দীব্যাপী রক্তস্নানের পরবর্তীকালে।

না, তোমার ক্ষেত্রে তেমন কিছু ঘটেনি। মাত্র বিয়াল্লিশ বছর বয়সে ভারতের সর্ববিখ্যাত জননেতা গান্ধীজিকে 'পরাজিত' করে তুমি ত্রিপুরী কংগ্রেসে বিজয়ী হয়েছিলে। গান্ধীজি সে কথা স্পষ্টভাবে স্বীকার করে গেছেন—'পট্টভির পরাজয় বাস্তবে আমারই পরাজয়।'

ওই একই বৎসরে অসুস্থ বিশ্বকবি তোমার আহ্বানে শান্তিনিকেতন থেকে ছুটে এসেছিলেন কলকাতায়। মহাজাতি সদনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার প্রসঙ্গে তোমাকে সম্মানিত করেছিলেন 'দেশগৌরব' পদে।

ভারত স্বাধীনতা অর্জনের আগেই আজাদ হিন্দ বন্দিদের লালকেল্লায় যখন বিচার হচ্ছে সে সময় তুমি সারা ভারতে সবচেয়ে বেশি আলোচিত ব্যক্তি, সবচেয়ে প্রিয় জননেতা! সুতরাং তোমার জন্মশতবার্ষিকীর উৎসব যে আজ নিতান্ত নিষ্প্রভ, তার হেতু সম্পূর্ণ ভিন্ন। এবার সে প্রসঙ্গে আসি : স্বাধীনতা প্রাপ্তির সুবর্ণজয়ন্তী অতিক্রান্ত। এই পঞ্চাশ বছর ধরে যারা নানা কায়দায় ভারতের শাসনক্ষমতা দখল করেছিল সেই রাজনীতি-ব্যবসায়ী দুঃশাসকরা আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছে যাতে জাতির মানসপটে তোমার কোনও স্মৃতি বা প্রভাব না থাকে। তাতে তাদের ব্যবসায় অসুবিধা হয়।

তোমার নিঃস্বার্থ দেশপ্রেম, আপসবিহীন সংগ্রামের স্মৃতিটাকে ওরা নিঃশেষে মুছে ফেলে দিতে চেয়েছিল : টোটাল অ্যানহিলিয়েশন! না হলে লোভ অথবা ভয় দেখিয়ে দেশটাকে শাসন তথা শোষণ করা সম্ভবপর নয়।

সহজবোধ্য হেতুতে। কারণ তোমার আপসবিহীন একনিষ্ঠ সংগ্রামের আদর্শটাকে ওই শাসকেরা ভয় করে। প্রতিবাদীকণ্ঠ যেখানেই সোচ্চার সরকারি শাসনযন্ত্র সেখানেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রথমে লোভ দেখায় কিনে নিতে, ব্যর্থ হলে দেখায় ভয় : জানে মেরে দেব!

তাতেও কাজ না হলে 'খতম' করে দেওয়া হয়। যেমনভাবে খতম করে দেওয়া হয়েছিল দিল্লির রাজপথে সফদার হাস্‌মিকে। কলকাতায় বিনোদ মেহতাকে, মুক্তি সেনকে, প্রতিবাদী শঙ্কর গুহনিয়োগীকে!

স্বাধীন ভারতে 'নেতাজি হটাও' মন্ত্রের প্রথম উদ্‌গাতা জওহারলাল নেহরু। কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে হেতুটা ছিল ভিন্ন জাতের। ষড়্‌রিপুর অন্তিম রিপু : মাৎসর্যবিষ! পরবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রীর তালিকায় একটিমাত্র ব্যতিক্রম : লালবাহাদুর শাস্ত্রী। শেরশাহ শূরের মতো অত্যন্ত স্বল্পকাল তিনি ছিলেন দিল্লির সিংহাসনে। তবু তারই মধ্যে একটি গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড বানাতে চেয়েছিলেন; ভারতীয় ভ্রাতৃপ্রেমের। তিনি 'ব্যতিক্রম' হিসেবে নিয়মের পরিচায়ক। স্বল্পস্থায়ী জনতা দলের প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাইও এক ব্যতিক্রম। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী অতি স্বল্পকাল উঠে বসেছেন সিংহাসনে; ফলে তাঁর কথাও বাদ দেওয়া যাক। বাদবাকি প্রত্যেকটি প্রধানমন্ত্রী : নেতাজি বিরোধী! সকলেই অবশ্য অসূয়ার বশে নয়, এঁরা নেতাজিকে সহ্য করতে পারেননি ভিন্ন ভিন্ন হেতুতে। একে একে বিচার করি:

জওহারলাল আর সুভাষচন্দ্র জাতীয় রাজনীতিতে অবতীর্ণ হন প্রায় একই সময়ে, যদিও সুভাষ ছিলেন বয়সে জওহারের চেয়ে নয় বছরের অনুজ। প্রথম পর্যায়ে কংগ্রেস রাজনীতিতে দুজনেই ছিলেন আধুনিকমনা, সোশালিস্ট এবং র‍্যাডিকাল। তাঁরা হাতে হাত মিলিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন জাতীয় কংগ্রেসে—গান্ধীজির বিকল্প নেতৃত্ব দিতে। কিন্তু সপ্তপদ ওঁরা একসঙ্গে চলতে পারলেন না। কারণ সুভাষ যদিও শেষদিন পর্যন্ত আপসহীন আদর্শে অবিচল থাকতে পারলেন, জওহার পারলেন না। তার মূল হেতু : সুভাষচন্দ্র ছিলেন শুধুমাত্র বিবেকচালিত স্বনির্ভর, আপসহীন চূড়ান্ত বিদ্রোহী দেশপ্রেমিক অথচ অন্তরে তিনি ছিলেন যোগীসন্ন্যাসী—নির্লিপ্ত, নিরাসক্ত, দুঃখে অনুদ্বিগ্নমন, সুখে বিগতস্পৃহ। অপর পক্ষে জওহারলাল ছিলেন ভোগবাদী দেশপ্রেমিক। কোনও কালেই তিনি স্বনির্ভর ছিলেন না। তরুণ বয়স থেকে জীবনের শেষ প্রাপ্তি হাত পেতে গ্রহণ করার জন্য তাঁর প্রয়োজন হয়েছে একজোড়া 'ক্রাচ'-এর।

পর্যায়ক্রমে সেগুলি : মোতিলাল, গান্ধীজি, মাউন্টব্যাটন এবং তদীয় পত্নী।
বয়ঃসন্ধিকাল থেকেই জওহার ছিলেন পিতৃদেবের সুপুত্র। ধনকুবের তনয়। মোতিলাল পুত্রকে বিলেতে পাঠিয়েছিলেন, স্কুলে পড়তে। চেম্বার্স বায়োগ্রাফিকাল ডিক্শনারিতে জওহারের ছাত্রজীবন সম্বন্ধে লেখা হয়েছে, "After an undistinguished career at Harrow School and Trinity College, Cambridge, where he took the natural sciences tripos, he read for the bar, returned home and served in the High Court of Allahabad." (বিলাতের হ্যারো স্কুলে এবং কেম্ব্রিজে মামুলি রেজাল্ট করে তিনি প্রকৃতিবিজ্ঞানের তিনটি বিষয়ে পাস করেন, পরে আইন পাস করে ভারতে ফিরে এসে এলাহাবাদ হাইকোর্টে প্র্যাকটিস শুরু করেন।) বলা বাহুল্য পিতৃদেবের ছত্রছায়ায়, তাঁর জুনিয়ার হিসেবে।
তুলনায় সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবনটি পর্যালোচনা করুন: কটকের র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলের সেরা ছাত্রটি ১৯১১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ভর্তি হন প্রেসিডেন্সি কলেজে। সেখানে ইংরেজ অধ্যাপক ওটেন ক্লাসে লেকচার দেবার সময় ভারতীয় ছাত্রদের বিরুদ্ধে জাতিগতভাবে মর্যাদাহানিকর কিছু মন্তব্য করেন। কয়েকজন ছাত্র ক্লাসের বাইরে ওটেন সাহেবকে এজন্য প্রহার করে। সুভাষ সেখানে আদৌ উপস্থিত ছিলেন না; কিন্তু ছাত্রদলে তাঁর অবিসংবাদিত নেতৃত্ব থাকায় এনকোয়্যারির সময় তাঁকেও ডাকা হয়। ওটেনকে কোন ছাত্রটি ঘুষি মেরেছিল সুভাষ তা জানতেন; কিন্তু তার নামোল্লেখ করতে অস্বীকার করেন। বাল্যবন্ধু দিলীপকুমার রায়ের স্মৃতিচারণ অনুসারে এই সময় স্যার আশুতোষ নাকি সুভাষকে বলেন, ঠিক আছে, কে মেরেছে তার নাম তোমাকে বলতে হবে না, কিন্তু কাজটা যে অন্যায় হয়েছিল, এটুকু তো তুমি স্বীকার করছ?
সুভাষ জবাবে বলেছিলেন, প্রফেসর ওটেন ঠিক কী ভাষায় সেই ছাত্রটিকে প্ররোচিত করেছিলেন তা তো আমি জানি না, স্যার! ফলে আমি কীভাবে মতামত দেব?—প্রফেসর ওটেন কি আপনাকে জানিয়েছেন ঠিক কী ভাষায় ভারত বিদ্বেষী প্রচার করে তিনি ওই ছাত্রটিকে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য করে তুলেছিলেন? আমাকে কি সেটা আগে জানাবেন? সেটা জানালে বলতে পারি—ঘুষি মারাটা অন্যায় হয়েছিল কি না। সুভাষ জওহারলালের মতো ব্যারিস্টারি পাশ করেননি, কিন্তু তাঁর এই জোরালো সওয়ালে স্যার আশুতোষের মতো বিচারকও কাৎ!
স্যার আশুতোষ তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার। উপায়ান্তরবিহীন হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই সেরা ছাত্রটিকে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বিতাড়িত করতে বাধ্য হলেন তিনি। কিন্তু সেখানেই থামলেন না। নিজে উদ্যোগ নিয়ে সুভাষকে স্কটিশ

চার্চ কলেজে ভর্তি হবার সুযোগ করে দিলেন। সুভাষ এইসব ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণের অবকাশে দর্শনে অনার্স নিয়ে বি. এ. পরীক্ষা দেন এবং প্রথম শ্রেণীতে অনার্সসহ উত্তীর্ণ হন। এই সময়ে ইউনিভার্সিটি অফিসার্স ট্রেনিং কোর্স-এ যোগদান করে সমরবিদ্যার প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করেন। অভিভাবকেরা তাঁকে আই. সি. এস. পরীক্ষা দেবার জন্য বিলেতে পাঠান। অনিচ্ছাসত্ত্বেও অভিভাবকের ইচ্ছানুসারে ১৯২০ সালে মাত্র ছয়মাসের প্রস্তুতি নিয়ে তিনি পরীক্ষায় বসেন। আই. সি. এস. পরীক্ষায় তিনি চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। ওই সঙ্গে মরাল সায়েন্সে কেম্ব্রিজের ট্রাইপসও লাভ করেন।

ছাত্রজীবনের ইতিহাসেই দুই নেতার আশমান-জমিন ফারাক হয়ে গেল। জওহারলাল যখন এলাহাবাদে এসে প্র্যাকটিস শুরু করেন তখন মোতিলাল নেহরু জওহারলালকে এনে হাজির করেন গান্ধীজির সামনে। কংগ্রেসে তখন মডারেট দলে মোতিলালের যথেষ্ট প্রতিপত্তি। তাঁর সুপারিশেই গান্ধীজি জওহারলালকে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত করেছিলেন। বলতে গেলে নেহরু পরিবারের 'ডাইনাস্টিক ন্যাস্টি রুলের' সেটিই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন!

ইতিমধ্যে সুভাষচন্দ্র আই. সি. এস. অফিসারের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে উনিশশো একুশ সালের ষোলই জুলাই বোম্বাইয়ে পৌঁছে সোজা গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করেন। মহাত্মাজি তাঁকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কাছে প্রেরণ করেন। সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুকে রাজনৈতিক গুরুরূপে বরণ করে নেন।

১৯২৯ সালে গান্ধীজির সুপারিশে জওহারলাল যখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হন, তার একবছর আগেকার কথা একটু আলোচনা করা দরকার। উনিশশো আঠাশ সালে কংগ্রেসের অধিবেশন হল কলকাতায়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন আর মূল সভাপতি ছিলেন পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু। মোতিলাল মডারেট; কিন্তু প্রখর বুদ্ধিমান আইনজীবীটি আগেই আঁচ করেছিলেন প্রগতিশীল স্বাধীনতাপন্থীরা মডারেটদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বাধার সৃষ্টি করবে। আর তাঁর বুঝতে বাকি ছিল না যে, এই বিরোধের সূচীমুখে আছেন দুই প্রগতিবাদী তরুণ তুর্কী—জওহারলাল ও সুভাষ। তাই মোতিলাল এমন ভাব প্রকাশ করলেন যে, ওয়ার্কিং কমিটির সম্ভাব্য সদস্যবৃন্দ তাঁর মতানুবর্তী না হলে মোতিলালের পক্ষে সভাপতিত্ব করা অসম্ভব। ফলে ছুটে আসতে হয় মহাত্মা গান্ধীকে। গত দুবছর কংগ্রেসে নামমাত্র উপস্থিত থাকলেও গান্ধীজি কংগ্রেসের কাজকর্মে নিজেকে তেমনভাবে জড়িয়ে ফেলেননি। খদ্দর, স্বদেশীপ্রচার এবং অচ্ছুতদের জাতে তোলার ব্যাপারেই তাঁর সময় ও শক্তি ব্যয় করতেন। এবারে তিনি কংগ্রেসের প্রয়োজনে এসে উপস্থিত হলেন। নেহরু কমিটির মূল প্রস্তাব তিনিই উত্থাপন করলেন।

'মুক্তির সন্ধানে ভারত' গ্রন্থে যোগেশচন্দ্র বাগল লিখছেন: 'বিষয় নির্বাচনী' কমিটিতে পণ্ডিত জওহারলাল ও সুভাষচন্দ্র একই ধরনের সংশোধনী উত্থাপন করেন। গান্ধীজি এবং এই দুজনের আপসের ফলে মূল প্রস্তাবের কোনো কোনো অংশ সংশোধিত ও পরিবর্জিত হয়। কিন্তু পরদিন গান্ধীজি কর্তৃক মূল প্রস্তাব উত্থাপনের পরই এই আপস না মেনে সুভাষচন্দ্র সংশোধনী উত্থাপন করেন ও পণ্ডিত জওহারলাল নেহরু তা সমর্থন করেন। মহাত্মাজি এইরূপ চুক্তিভঙ্গহেতু তাঁদের ভর্ৎসনা করতে ছাড়েননি।' ফলে, দেখা যাচ্ছে, ১৯২৮-এ দুই তরুণ তুর্কি জওহারলাল ও সুভাষ একই ক্যাম্পে আছেন। মোতিলাল মডারেট দলের নেতা আর গান্ধীজি দুই দলের সমন্বয় করতে সচেষ্ট।

আপনাদের নিশ্চয় স্মরণ আছে, এই তথাকথিত 'নেহরু-রিপোর্ট' অনুসারেই (যেটার খসড়া প্রস্তুত করেছেন স্বয়ং গান্ধীজি) স্থির হয় যে, ব্রিটিশ পার্লামেন্ট যদি পরে বৎসরের একত্রিশে ডিসেম্বরের মধ্যে ভারতকে 'ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস' না দেয় তাহলে কংগ্রেস পূর্ণ স্বরাজের দাবিতে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু করবে এবং ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করবে।

ওই বছরে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা পর পর ঘটে গেল ভারতে। প্রথম ঘটনা 'সাইমন কমিশন'। যতটুকু স্বায়ত্ত শাসন ক্ষমতা ভারতবাসীকে দেওয়া হয়েছে তার বেশি কিছু দেওয়া যায় কি না এটা যাচাই করে দেখতে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট একটি কমিশন পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন: সাইমন কমিশন। বড়লাট লর্ড আরউইন বিশিষ্ট নেতাদের দিল্লিতে ডেকে পাঠান। সাইমন কমিশনে তাঁদের বক্তব্য পেশ করতে অনুরোধ করেন। এটা ব্রিটিশ সরকারের একটা কূটনৈতিক কালহরণের চাল — কারণ বিলেতে তখন সাধারণ নির্বাচন আসন্ন; রক্ষণশীল সরকার তাই একটি লোক-দেখানো কমিশন প্রেরণ করল স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে। কংগ্রেস এই কমিশনের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করল। পুকার উঠল: সাইমন গো ব্যাক!

সাইমন উনিশশো আঠাশ সালের তেসরা ফেব্রুয়ারি বোম্বাইতে পদার্পণ করেন। সর্বত্র হরতাল পালিত হয়। সাইমনকে 'গো ব্যাক'-ই করতে হল দুমাস পরে। কিন্তু আবার সাইমন এলেন। এবার দমন নীতির মাধ্যমে অনুসন্ধান চলল। সাইমন যেখানে যান হরতালকে ভাঙতে সেখানেই 'লাঠিচার্জ' শুরু হয়ে যায়। গান্ধীজি তাই একে বিদ্রূপ করে বলেছিলেন 'যষ্টিমধুর কমিশন'!

সাইমন লাহোরে পৌঁছলেন ত্রিশ অক্টোবর। এখানে বিক্ষোভকারীদের নেতৃত্ব দেন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এবং লালা লাজপৎ রায়। তাঁদের ওপর প্রচণ্ড লাঠির আঘাত পড়ে। লালা লাজপৎকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। দিন পনের পরে হাসপাতালে লালা লাজপৎ শহিদ হয়ে যান। সতেরোই নভেম্বর, ১৯২৮।

ঠিক এক মাস পরে বিপ্লবী দলের নায়ক নির্ভীক ভগৎ সিং প্রকাশ্য দিবালোকে লাহোরের পুলিস সুপারিন্টেন্ডেন্ট স্যান্ডার্সকে (এই স্যান্ডার্সের ব্যবস্থাপনাতেই লালা লাজপতের ওপর যষ্টিবর্ষণ হয়েছিল) হত্যা করেন। বিপ্লবী ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত, শুকদেব, যতীন্দ্রনাথ দাস প্রভৃতিকে গ্রেপ্তার করে 'লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা' রুজু হল। হাজতে বিচারাধীন আসামীদের প্রতি অসম্মান ও দুর্ব্যবহার করার প্রতিবাদে ষড়যন্ত্র মামলার প্রতিটি আসামী আমরণ অনশন শুরু করেন। অন্য আসামীদের পুলিস বলপূর্বক আহার গ্রহণে বাধ্য করেছিল, কিন্তু একজন ব্যতিক্রম হয়ে রইলেন, যতীন দাস। একাদিক্রমে ৬৩ দিন অনশনের পর যতীন দাস শহিদ হয়ে গেলেন। যতীন্দ্রনাথের মহাশব কলকাতায় আনা হয়েছিল।

এই অধম বৃদ্ধ প্রবন্ধ লেখক তখন কলেজ স্ট্রিট আর বৌবাজারের মোড়ে দাদার কাঁধে চেপে মহাশবের মহাযাত্রা দেখেছিল (১৩.৯.১৯২৯)। এখনো স্মরণ হয় দাদাকে প্রশ্ন করেছিলাম, 'ওঁকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে রে, দাদা? শ্মশানে?'

আমার দাদা ঊর্ধ্বমুখে স্কন্ধস্থিত বালককে বলেছিলেন—আজও স্পষ্ট মনে আছে, 'নারে নারাণ! লালা লাজপৎ রায়ের কাছে।'

বোকার মত প্রশ্ন করেছিলাম, 'লালা লাজপৎ কে রে দাদা?'

—'সেই যাঁকে লাঠিপেটা করে হত্যা করেছিল স্যান্ডার্স।'

আবার জানতে চাই, 'স্যান্ডার্স লোকটাই-বা কে?'

'ওই যাকে গুলি করে খতম করেছিলেন দেশপ্রেমিক ভগৎ সিং, শুকদেব, বটুকেশ্বর আর যতীন দাস!'

আমার বয়স তখন পাঁচ। দাদার পনেরো।

সাধারণ ভারতবাসীর এই দেশপ্রেমের মূলেই ক্রমে ভাঙন ধরল। প্রকাশ্যে নয়, আন্তর গভীরে। কংগ্রেসের প্রগতিদলের মধ্যে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তার পূর্বেই দার্জিলিঙে 'স্টেপ অ্যাসাইড' করেছেন। বিক্ষুব্ধ বাংলায় যতীন্দ্রমোহন আছেন, বিধানচন্দ্র আছেন, কিন্তু নেতা সুভাষচন্দ্র। ওইসব অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত বিপ্লবীদের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি ছিল সুভাষের। গান্ধীজির এই সশস্ত্রবিপ্লবী পন্থায় আদৌ সায় নেই। আর জওহারলাল তখন পেন্ডুলাম। হিংসা আর অহিংসা। সশস্ত্র বিপ্লব আর অসহযোগ। জওহার দুলছেন, এর মধ্যে একটাকে তাঁকে বেছে নিতে হবে। তরুণ তুর্কী জওহার সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করবেন কি না চিন্তা করতে থাকেন। অর্থাৎ স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা হব অথচ 'যেমন বেণী তেমনি রবে' শহিদ হব না—পন্থার সন্ধানে মগ্নচৈতন্য। এই দোদুল্যমান অবস্থায় সিদ্ধান্তটা জওহারলালকে নিতে হল না। ভগবানই তাঁর হয়ে সেটা নিয়ে নিলেন। মাত্র দুবছর পরে ১৯৩১-এ প্রয়াত হলেন মোতিলাল নেহরু।

ক্রাচ ছাড়া এক পা চলতে পারেন না—সুতরাং পিতৃহীন জওহারলাল এসে সম্পুটে আশ্রয় নিলেন গান্ধীজির কাছে। সুভাষচন্দ্রের প্রগতিশীল আপসহীন ক্যাম্পের বিপক্ষে। বিদ্রোহী তরুণটি কুক্ষিগত হয়েছে একথা নিশ্চিতভাবে বুঝতে পেরে গান্ধীজি তাঁকে দ্বিতীয়বার কংগ্রেস সভাপতি করে দিলেন ১৯৩৬ সালে। সে সময় সুভাষ কারাপ্রাচীরের ওপারে।

জওহারলালের এই দুইবার ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতিত্বের অন্তর্বর্তীকালে সুভাষচন্দ্রের জীবনের ঘটনাগুলির সংক্ষিপ্তসার এই প্রসঙ্গে সাজিয়ে নেওয়া যেতে পারে। একটু আগে থেকে বরং শুরু করা যাক—

১৯২৪, এপ্রিল ৯, সুভাষচন্দ্র কলিকাতা কর্পোরেশনের চিফ একসিকিউটিভ অফিসার নিযুক্ত হন। বেতন ৩,০০০ টাকা। তিনি তার অর্ধেক গ্রহণ করতেন, বাকি অর্ধেক দেশসেবায় দান করতেন।

১৯২৪, অক্টোবর ২৫, এলগিন রোডের বাড়ি থেকে ভোর রাত্রে রেগুলেশন অ্যাক্ট, ১৮১৮ ধারা মোতাবেক গ্রেপ্তার করে তাঁকে অলিপুর সেন্ট্রাল জেলে রাখা হয়।

১৯২৫, জানুয়ারি ২৫, সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক গুরু চিত্তরঞ্জন দার্জিলিঙে 'স্টেপ অ্যাসাইড'-এ প্রয়াত। সুভাষচন্দ্র তখন মান্দালয় জেলে। অজীর্ণ ও ফ্লুতে প্রায় মৃত্যুশয্যায়।

১৯২৭, ফেব্রুয়ারি, অবস্থার অবনতি হওয়ায় মান্দালয় জেল থেকে সুভাষকে রেঙ্গুন সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হল। একমাস পরে হাসপাতাল থেকে রেঙ্গুন শহরের উপকণ্ঠে ইনসিন জেলে নিয়ে যাওয়া হল।

মে মাসে সুভাষচন্দ্রকে ইনসিন জেল থেকে স্থলপথে রেঙ্গুনে নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে জলপথে আনা হয় ডায়মন্ড হারবারে। এখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন বাংলার অ্যাসিস্টেন্ট ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিস মিঃ লোম্যান। তিনি সুভাষকে অনুরোধ করেন গভর্নরের নিজস্ব স্টিমারে ডায়মন্ড হারবার থেকে কলকাতায় আসতে। লোম্যানের কোনও অসৎ উদ্দেশ্য আছে আশঙ্কা করে সুভাষচন্দ্র এ আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। তখন লোম্যান সুভাষকে গভর্নরের আদেশনামাটি দেখান: ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য সুভাষচন্দ্রকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য কিছুদিন সিমলায় বাস করে নভেম্বর মাসে সুভাষ কলকাতায় ফিরে এলেন।

১৯২৮, ডিসেম্বর: পণ্ডিত মোতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে কলকাতায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে নেহরু কমিটির (গান্ধীজির খসড়াকৃত) প্রস্তাবিত স্বায়ত্তশাসন এবং একত্রিশে ডিসেম্বর ১৯২৯-এর মধ্যে ব্রিটিশকে ভারত

ছেড়ে যেতে হবে এই প্রস্তাব ধ্বনিভোটে গৃহীত হয়। স্বায়ত্তশাসনের পরিবর্তে সুভাষচন্দ্র আনীত পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব ১,৩৫০-৯৭৩ ভোটের ব্যবধানে বাতিল হয়ে যায়। পেন্ডুলাম তখন নিশ্চল। তার দোদুল্যমানতা থেমে গেছে। পিতা এবং পিতৃপ্রতিম গান্ধীজির বিরুদ্ধে এবার ভোট দিলেন না জওহারলাল। অবশ্য সপক্ষেও নয়। ইতিহাসের গতিবেগে ঘটনাস্রোতে এগিয়ে যাওয়া থেকে বিরত হয়ে একটি ছোট্ট বাস্তব ঘটনার কথা এইখানে লিপিবদ্ধ করে যাই, যাতে দেশনায়ক নেতাজি নন, দেখা যাবে একজন দরদী মানুষকে—বিদ্যাসাগর-বিবেকানন্দের উত্তরসূরীকে।

সুভাষচন্দ্রকে ভোর রাত্রে এলগিন রোডের বাড়ি থেকে আচমকা গ্রেপ্তার করা হয় ২৫.১০.১৯২৫ তারিখে। দুমাস আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে রেখে তাঁকে মান্দালয় জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। এ খবরটা এলগিন রোডে জানানোর প্রয়োজন বোধ করেনি ইংরেজ সরকার। সুভাষের ভাইপোদের মধ্যে কেউ একজন দুঃসংবাদটা নিয়ে এলেন। কেউ বলেন তিনি রেঙ্গুনে আছেন, কেউ বলেন মান্দালয়, কেউ-বা ইনসিন-এ। প্রকৃত তথ্যটা জানা যাচ্ছে না; অপরপক্ষে বন্দিদের মধ্যে কথা চালাচালি মারফৎ শোনা গেল সুভাষচন্দ্র অত্যন্ত অসুস্থ। সুভাষজননী প্রভাবতী দেবী শয্যা নিলেন। দাদা শরৎচন্দ্র অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। বাস্তবে সুভাষচন্দ্রকে বাড়িতে চিঠি লেখার অনুমতি দিতে মান্দালয় জেল কর্তৃপক্ষ পাক্কা দুইমাস সময় নিয়েছিলেন। প্রায় আড়াইমাস পরে সুভাষচন্দ্রের স্বহস্তলিখিত একখানি পোস্টকার্ড এসে পৌঁছল এলগিন রোডের বাড়িতে। বিচিত্র সেই পত্রটি। জানি না, সেটি বর্তমানে 'নেতাজি ভবনে' প্রদর্শনী কক্ষে রাখা আছে কি না। সুভাষচন্দ্র পত্রখানি লিখেছেন অগ্রজ শরৎচন্দ্রকে। ইংরেজি ভাষায়। বাধ্য হয়ে। যাতে জেলারের পক্ষে 'সেনসর' করতে অসুবিধে না হয়। চিঠিখানি আমি কোথায় পড়েছি মনে করতে পারছি না; কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক নিমাইসাধন বসু (বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ আয়োজিত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্দুমতী 'হল'-এ তাঁর বক্তৃতায়) এই চিঠিখানির প্রসঙ্গ পুনরায় উল্লেখ করেছিলেন। তাই সেটির কথা আজও মনে আছে।

পোস্টকার্ডের প্রথম তিনটি পংক্তিতে নিজের শারীরিক কুশলবার্তা। অর্থাৎ 'আমার শরীর ভাল আছে। এখানে ঔষধপত্র নিয়মিত দেওয়া হচ্ছে। আমি ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠছি।' পরের পংক্তিটি সান্ত্বনা বাক্য—'মাকে দুর্ভাবনা করতে বারণ করো। আমি কিছুদিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে তাঁর কাছে ফিরে যাব।' ব্যস! পোস্টকার্ডের বাকি অংশ একজন পাঞ্জাবী শিখ ড্রাইভারের বিষয়ে—

'মেজদা, তোমাকে একটা জরুরি কাজের দায়িত্ব দিচ্ছি। গ্রেপ্তার হবার ঠিক আগের দিন কর্পোরেশন অফিসে আমার সঙ্গে এসে দেখা করেছিল একজন পাঞ্জাবী শিখ ড্রাইভার, হরবিলাস সিং। তার হেভি ভেহিকেলস-এর লাইসেন্স আছে। নিদাগ

লাইসেন্স। সে আমার মাধ্যমে ক্যালকাটা কর্পোরেশনে একটা ড্রাইভারের চাকরির জন্য দরখাস্ত করে। তার আবেদনপত্র, ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং বেশ কয়েকটি সুপারিশপত্র একটি ম্যানিলা খামে টোন সুতো দিয়ে বাঁধা অবস্থায় আমার ঘরে (অলডারম্যানের অফিসঘর) পিছনের আলমারিতে উপরের তাকে রেখে এসেছি। অফিসের কেউ তো তা জানে না। পরদিন আচমকা গ্রেপ্তার হওয়ায় ও বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা করে আসতে পারিনি। বেচারির চাকরি হবে কি না তা আমি জানি না। কে আমার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন সে খবরও পাইনি। তুমি নিজে না হলেও বিশ্বস্ত কোনো কর্মীকে দিয়ে ব্যবস্থা করো যাতে হরবিলাস সিং তার অরিজিনাল সার্টিফিকেট-সহ লাইসেন্সটি ফেরত পায়। আমাকে জবাব দেবার সময় এ কাজটি যে সুসম্পন্ন হয়েছে, তা জানিয়ে আমাকে নিশ্চিন্ত করো।'

ব্যস। পোস্টকার্ড-এ আর ঠাঁই নেই!

স্বদেশভূমি থেকে বহুদূরে, বিদেশের এক কারাগারে প্রচণ্ড অসুস্থ এক রুগী—মাকে সান্ত্বনা দিতে যিনি এক লাইন লিখেছেন, 'আমি ভাল আছি, শীঘ্রই ফিরে আসব' — সেই প্রায় মৃত্যুশয্যালীন মানুষটির এই চিঠিখানি পড়তে পড়তে আমার মনে পড়ে গিয়েছিল সক্রেটিস-এর কথা।

সক্রেটিসকে বিচারক একটা সুযোগ দিয়েছিল—'আপনি যদি আপনার মতামতগুলি প্রত্যাহার করে নেন তাহলে আপনাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে না।' সক্রেটিস বিচারককে বলেছিলেন—'সজ্ঞান মিথ্যাভাষণ একটি অন্যায় কাজ এ বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত; কিন্তু 'মৃত্যু' কী তা আমি জানি না। তাই স্বজ্ঞানে অন্যায় আচরণ না করে আমি বরং ওই অজানা মৃত্যুকেই বরণ করে নেব।'

প্রহরী একপাত্র 'হেমলক' বিষ ওর হাতে তুলে দিল। ক্ষমা প্রার্থনা করে বলল, হুজুর! আমার অপরাধ নেবেন না। আমি হুকুমের চাকর মাত্র।

সক্রেটিস বললেন, 'তোমার বিরুদ্ধে আমার কোনো ক্ষোভ নেই, বন্ধু! তোমাকে আমি ক্ষমা করেছি।' শিষ্যদল তাঁকে ঘিরে ধরেছে। সক্রেটিস ধীরে ধীরে পুরো পাত্রের তীব্র হলাহল পান করে প্রস্তরশয্যায় শুয়ে পড়লেন।

আসন্ন মৃত্যুর জন্য শিষ্যদল প্রতীক্ষা করছে।

হঠাৎ মৃত্যুশয্যা থেকে উঠে বসলেন সক্রেটিস। সবাই সোৎসাহে ঘনিয়ে এল। সক্রেটিস তাঁর প্রিয় শিষ্য প্লেটোকে বললেন—'ও হো! একটা ভুল হয়ে যাচ্ছিল! আমাদের পাড়ার মুদি আমার কাছে দুটো মুরগির দাম পায়। সেটা মেটানো হয়নি। তুমি আমার অস্থাবর সম্পত্তি থেকে ওটা মিটিয়ে দিও।' বলেই আবার শুয়ে পড়লেন।

সুভাষচন্দ্রের মেজদাকে লেখা চিঠিটা সেই জাতের অনুরোধ।

শাসক ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে ভারতবর্ষকে একটি পূর্ণস্বাধীন রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা করার কথা সর্বপ্রথম বলেছিলেন শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, তাঁর 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় –'We want absolute autonomy free from British control.' সেটা বিগত শতাব্দীর ঊষাযুগে। স্বামীজি তার আগেই প্রয়াত (১৯০২); ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, সত্যেন, কানাই তখন একে একে শহিদ হচ্ছেন। ১৯০৮ সালের আগে থেকেই সারা ভারত জুড়ে গুপ্ত বিপ্লবীদলগুলি গঠিত হতে থাকে। আলিপুর মামলার পর দিল্লিতে প্রকাশ্য শোভাযাত্রায় লর্ড হার্ডিঞ্জ-এর ওপর বোমা ফেললেন রাসবিহারীর নির্দেশে নদীয়ার বসন্ত বিশ্বাস। ফাঁসিতে ঝুললেন নির্ভীক বসন্ত; ব্রিটিশ গোয়েন্দা রাসবিহারী বসুর সন্ধানই পেল না। তার দু'বছর পরে সর্বভারতীয় সশস্ত্র বিপ্লবের অভ্যুত্থান ঘটাতে তৎপর হয়ে উঠেছিলেন বাঘা যতীন আর রাসবিহারী। কিন্তু তাঁদের সর্বভারতীয় উত্থানের পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়ে পড়ে, মীরজাফর আলির এক উত্তরসাধকের বিশ্বাসঘাতকতায়। লোকটার নাম কৃপাল সিং। তার ফলে সশস্ত্র বিপ্লবের ষড়যন্ত্র করার অপরাধে ফাঁসি হল কর্তার সিং, পিংলে, আমিরচাঁদ, বালমুকুন্দ আর অবোধবিহারীর। এবারও গোয়েন্দা বিভাগ মূল দলপতি মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বোসকে খুঁজে পেল না।

১৯১৫ সালে বাঘাযতীন চারজন সহকারী নিয়ে উড়িষ্যার বালেশ্বরে বুড়িবালাম তীরে ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে প্রাণ দিলেন (১০.৯.১৫)। তার পাঁচ মাস আগে রবীন্দ্রনাথের এক কল্পিত কাজিন-ব্রাদারের ছদ্মবেশে জাল পাসপোর্ট সম্বল করে রাসবিহারী কলকাতার বন্দর থেকে 'সানুকি মারু' জাহাজে চেপে রওনা দিয়েছেন জাপানের উদ্দেশে।

প্রসঙ্গান্তরে যাবার আগে পাঠককে আর একটি তথ্য এখানে জানিয়ে যাই :

মীরজাফর যদি রক্তবীজের বংশধর হয়, তবে কানাইলালও মৃত্যুঞ্জয়ী। রাসবিহারী পরিকল্পিত মহাবিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার দীর্ঘ পঁচিশ বছর পর, একজন গুপ্ত বিপ্লবী ওই বিশ্বাসঘাতক কৃপাল সিংকে লন্ডনে খুঁজে বার করেছিলেন। গুপ্তঘাতকের হাত থেকে ঐ বিশ্বাসঘাতক রাজসাক্ষীকে রক্ষা করতে ব্রিটিশ সরকার কৃপাল সিংকে বিলেতে সপরিবারে বসবাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। ওই অজ্ঞাত গুপ্তবিপ্লবী সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন ব্ল্যাক আউটের লন্ডনে কৃপাল সিংকে খুঁজে বার করে লন্ডনের রাস্তাতেই গুলি করে হত্যা করেন। বিপ্লবী ধরা পড়েননি! তাই তাঁর নামটা আপনাদের জানাতে পারছি না। কিন্তু তথ্যটা কোথা থেকে সংগ্রহ করেছি তা জানাতে পারি। বিপ্লবী নলিনীকান্ত গুহ রচিত গ্রন্থ 'বাংলায় বিপ্লববাদ'-এর (চতুর্থ সংস্করণ) ১৩৬ পৃষ্ঠায়। এত কথা বলছি এই তথ্যটা বোঝাতে যে, ১৯১৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে গান্ধীজি যখন ভারতে এসে উপস্থিত হলেন তাঁর অহিংস অস্ত্রে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে

সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে, তার পূর্বেই এখানে সশস্ত্র বিপ্লবীরা স্বাধীনতা সংগ্রামের অনেকগুলি অনুচ্ছেদ রচনা করে রেখেছেন। গান্ধীজি ভারতে ফিরে এসে ভারতীয় রাজনীতিতে প্রথম প্রবেশ করলেন আটচল্লিশ বছর বয়সে, ঠিক যে বয়সে পৃথিবীর ইতিহাসে শাশ্বত কীর্তি প্রতিষ্ঠা করে সুভাষচন্দ্র তাইহকু বিমানবন্দর থেকে শেষবারের মতো অন্তর্হিত হয়েছেন।

বছর চার-পাঁচ সময় লাগল গান্ধীজির, পরিস্থিতিটা সমঝে নিতে। চরকা, খদ্দর, সর্বোদয় এবং অহিংসা-অসহযোগের বনিয়াদটুকু গড়ে তুলতে। তারপর গান্ধীজি ডাক দিলেন সারা ভারতকে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে (১৯২১)। সে সময় সারা ভারত চাপা ক্রোধের আগুনে জ্বলছে। দুবছর আগে জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরস্ত্র বৃদ্ধ-শিশু-নরনারীদের মেশিনগান চালিয়ে হত্যা করেছে মাইকেল ও-ডায়ারের ভাড়া করা সৈনিকেরা। প্রাণভয়ে নিরস্ত্র মানুষ কুয়োর ভিতর ঝাঁপ দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'নাইটহুড' ত্যাগ করেছেন। সমগ্র ভারতের যুবসমাজ প্রতিশোধস্পৃহায় প্রহর গুনছে। ঠিক সেই ব্রাহ্মমুহূর্তে গান্ধীজি বললেন—না! আঘাতের পরিবর্তে আঘাত নয়। অহিংস-অসহযোগ এবং আইন-অমান্য আন্দোলনের মাধ্যমে আমি ঐ পাশব শক্তিকে কব্জা করব। তোমরা আমার সঙ্গে এস, আমি স্বরাজ এনে দেব মাত্র একবছরের মধ্যে। গান্ধীজির প্রতিশ্রুতি ব্যর্থ হলেও আহ্বান ব্যর্থ হয়নি। আশ্চর্য উন্মাদনায় সমগ্র দেশ ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই আন্দোলনে। স্কুল-কলেজে পঠন-পাঠন বন্ধ হবার জোগাড়—ছাত্রের অভাবে। অনেক সরকারী চাকুরিয়া পদত্যাগ করে বেকার হয়ে গেলেন। সেই আবেগেই দুর্লভ আই. সি. এস. চাকরির অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার ছেঁড়াকাগজের ঝুড়িতে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন সুভাষচন্দ্র। এসে যোগ দিলেন অহিংস সংগ্রামে।

কিন্তু কী দুর্ভাগ্য! যুক্তপ্রদেশের এক প্রত্যন্ত গ্রাম চৌরিচৌরায় কিছু হিংসাত্মক ঘটনা ঘটায় জাতির নেতা এককথায় আন্দোলনকে থামিয়ে দিলেন! হল্ট—

সারা ভারতের ব্যাপক অসহযোগ আন্দোলন মুহূর্তমধ্যে স্তব্ধ হয়ে গেল। গান্ধীজি সেই হিংসাত্মক ঘটনার প্রায়শ্চিত্ত করতে তাঁর সবরমতী আশ্রমে গিয়ে অনশন করতে বসলেন। ইংরেজ শাসক হাসল—বুঝল, ভবিষ্যতে ওই নাঙ্গা ফকির যদি আবার এ জাতীয় আন্দোলনের ডাক দেয় তাহলে সামান্য কিছু এজেন্ট প্রভোকেটরের মাধ্যমে সুযোগ মতো কিছু হিংসাত্মক ঘটনা ঘটিয়ে আন্দোলন সহজেই থামিয়ে দেওয়া যাবে। গান্ধীজি যখন এইভাবে হঠাৎ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন তখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষচন্দ্র, লালা লাজপৎ এবং মোতিলাল নেহরু জেলে আবদ্ধ। আশ্চর্যের কথা 'মূল গায়েন' গান্ধীজিকে পুলিসে ধরেনি। তিনি ছিলেন জেলের বাইরে। এ করুণার উৎসমুখে কী ছিল জানি না, কিন্তু এটুকু আন্দাজ করতে পারি যে, গান্ধীজি ইচ্ছা করলে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে আবদ্ধ সহকর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতি

অনায়াসে পেতেন। গান্ধীজি সে চেষ্টা আদৌ করেননি। প্রয়োজনই বোধ করেননি সহকর্মী ও সহযোদ্ধাদের মতামত নেবার। একনায়কতন্ত্রী নেতার মতো প্রত্যাহার করে নিলেন আন্দোলন। বললেন—ভারতীয় মানসিকতা এখনও সম্পূর্ণ অহিংস হতে শেখেনি। ফলে তাঁর আন্দোলন একটা 'হিমালয়ান্তিক ভ্রান্তি'।

কী আশ্চর্য! কী অপরিসীম আশ্চর্য! গান্ধীজির মতো পরিণত বুদ্ধিমান জননেতা একথা বুঝতে পারলেন না যে, সারা ভারত জুড়ে যারা অসহযোগ আন্দোলনে মেতে উঠেছে তারা তাঁর আশ্রমিক স্বেচ্ছাসেবক নয়। দাণ্ডী পদযাত্রার ঊনআশিজন আশ্রমিক সঙ্গীর মধ্যে কেউ যদি হিংসার আশ্রয় নিয়ে বসত তাহলে গান্ধীজি ক্ষুব্ধ হতে পারতেন। সে অধিকার তাঁর ছিল, কারণ আশ্রমের প্রত্যেকটি শিষ্য ও শিষ্যা তাঁর মন্ত্রে দীক্ষিত। যুক্তপ্রদেশের প্রত্যন্ত গ্রাম চৌরিচৌরার সাধারণ আনপড় গাঁওয়াড় তা নয়। তারা স্বতই বিবেকতাড়িত। থানার দারোগা চৌঠা ফেব্রুয়ারি গ্রামের নিরস্ত্র নরনারীর ওপর লাঠি চার্জ করে। শোভাযাত্রাকারীরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খায়। তারা প্রতি-আক্রমণ করেনি; কিন্তু ওইসব আহত নরনারী যারা সড়কের ওপর রক্তক্ষয়ী মৃত্যুবরণ করেছে— পুলিস যাদের উঠিয়ে নিতে দেয়নি, তাদের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবেরা পরদিন, পাঁচই ফেব্রুয়ারি চৌরিচৌরা থানা ঘেরাও করেন। তাতে আগুন লাগিয়ে দেন। থানার দারোগা এবং একুশজন কনস্টেবল অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায়। মহাত্মা গান্ধী এই সংবাদ পেয়ে তাঁর সর্বভারতীয় আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। বলেন— তাঁর অসময়োচিত আন্দোলন একটি 'হিমালয়ান্তিক ভ্রান্তি' (Himalayan Blunder)। শুধু এই একবারই নয়, তাঁর দুই দশকব্যাপী অবিসংবাদিত একনায়কতন্ত্রের নেতৃত্বকালে তিন-তিনবার তাঁর আন্দোলন যখন চরম অবস্থার দিকে এগিয়েছে তখনই তিনি জাতিকে পেছন থেকে টেনে ধরেছেন। বাইশ সালে চৌরিচৌরার ঘটনায়, ত্রিশ সালে লবণ আইন ভঙ্গ আন্দোলন যখন তুঙ্গে উঠেছে তখন এবং বিয়াল্লিশ সালে — না ভুল হচ্ছে, সেবার যুদ্ধকালীন অবস্থায় গান্ধীজিকে ব্রিটিশ সরকার সে সুযোগ দেয়নি। এখানে অভারতীয় এক বিশিষ্ট সাংবাদিকের এ বিষয়ে মতামত তুলে ধরা যেতে পারে, 'Gandhi's reaction to government oppression was essentially emotional.....Congress never became a truely revolutionary movement, Gandhi remained round its neck like the Ancient Mariner's albatross, inhibiting its actions, dividing its purpose, confusing the genuine revolutionaries and ultimately ensuring the partition of India'. [The Last Years of British Raj, Michael Edwards, p.44]

[সরকারি দমননীতি সম্বন্ধে গান্ধীজির প্রতিক্রিয়া প্রায়শই ভাবাবেগের বহিঃপ্রকাশ ..... কংগ্রেস কোনোদিনই একটি সার্থক বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে উঠতে পারেনি, কারণ কংগ্রেসের গলায় সর্বসময় জড়িয়ে ছিল গান্ধীবাদ, ঠিক যেমন ছিল 'এনসিয়েন্ট ম্যারিনারের' গলায় মৃত অ্যালবাট্রসটা। কংগ্রেসের যাত্রাপথে বাধা সৃষ্টি করে, উদ্দেশ্যকে সূচীমুখ হতে না দিয়ে এবং প্রকৃত বিপ্লবীদের বারে বারে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করে। যার শেষ ফসল : বিভক্ত ভারত।]

সুভাষচন্দ্র জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বাইরে এসে বলেছিলেন—না ওটা 'হিমালয়ান্তিক ভ্রান্তি' নয় 'জাতীয় সর্বনাশ' (National Calamity)। চৌরিচৌরার দুর্ঘটনার কথা আমি বলছি না, বলছি আন্দোলন প্রত্যাহারের দুর্ঘটনাটা।

এইখানে আরও উল্লেখ করি, সুভাষচন্দ্র ওই মন্তব্য করেছিলেন যখন গান্ধীজির নির্দেশে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের শোকসভার একটি বিশেষ শোকপ্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিতে হল (মার্চ, ১৯২৪)।

কলকাতায় নির্মম অত্যাচারী পুলিস কমিশনার চার্লস টেগার্টকে নিশ্চিহ্ন করার নির্দেশ লাভ করেছিলেন উত্তরপাড়া বিদ্যাপীঠের অষ্টাদশবর্ষীয় তরুণ, অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত গোপীনাথ সাহা। গোপীনাথ বারোই জানুয়ারি (১৯২৪) চৌরঙ্গী অঞ্চলে টেগার্টকে গুলি করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে গাড়ির পার্শ্ববর্তী যাত্রী মিস্টার ডে সেই গুলিতে প্রাণত্যাগ করেন। গ্রেপ্তারের পর গোপীনাথ আত্মপক্ষ সমর্থনে অস্বীকৃত হন এবং কোনও আইনজীবীকে নিয়োগ করতেও স্বীকৃত হন না। বিচারকের 'গিল্‌টি অর নট গিল্‌টি' এই প্রশ্নের উত্তরে গোপীনাথ বলেন 'লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার জন্য আমি গিল্‌টি—টেগার্ট নিহত হলে বলতুম, আমি আনন্দিত!' মার্সি পিটিশনেও তিনি অস্বীকৃত হন। পয়লা মার্চ তাঁর ফাঁসি হয়ে যায়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস ওই অষ্টাদশবর্ষীয় শহিদের জন্য একটি শোকপ্রস্তাব আনে। সুভাষচন্দ্র ছিলেন সেই সভায়। গান্ধীজির নির্দেশে প্রাদেশিক কংগ্রেস ওই শোকপ্রস্তাবটি গ্রহণ করতে পারেনি।

সুভাষচন্দ্রের অন্তরজ্বালা সহজেই অনুমেয়। পিতৃবিয়োগের পর জওহারলাল পরিপূর্ণভাবে আত্মপক্ষসমর্পণ করলেন। গান্ধীজির নেতৃত্ব বিনাবিচারে মেনে নিলেন। বিদ্রোহী তরুণের প্রতিবাদী স্বরূপটা সম্পূর্ণ করায়ত্ত হয়েছে বুঝতে পেরে মহাত্মাজি আজ্ঞাবাহী জওহারলালকে দ্বিতীয়বার কংগ্রেস সভাপতি করে দিলেন; ১৯৩৬ সালে। সে সময় সুভাষচন্দ্র কারাপ্রাচীরের ও প্রান্তে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, জওহারলালের পিতৃবিয়োগ হয় ১৯৩৬-এ; সুভাষের পিতা জানকীনাথ বসু পরলোক গমন করেন, সত্তর বছর বয়সে, কলকাতার বাসভবনে ডিসেম্বর ১৯৩৪-এ। সুভাষ সে সময় ইউরোপে নির্বাসিত। পিতার

অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে তিনি ভারতে ফিরে আসেন। ইংরেজ সরকার তাতে আপত্তি করেনি; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ততদিনে বড্ড দেরি হয়ে গেছে। পিতা-পুত্রে তাই সাক্ষাৎ হয়নি। পিতৃশ্রাদ্ধ সমাপনান্তে সুভাষকে পুনরায় বিলেতে ফিরে যেতে বাধ্য করা হয়। বস্তুত ভারতে তাঁর উপস্থিতিটাকেই ততদিন ভয় করতে শুরু করেছে শাসক সম্প্রদায়। এই সময়েই তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'দ্য ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল ১৯২০-৩৪' ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত হয়। তৎকালীন সারা ইউরোপে এমনকি গ্রেট-ব্রিটেনের মননজীবী মহলেও প্রচণ্ড আলোড়ন দেখা দেয়। ইংরেজ সরকার ভারতে গ্রন্থটির প্রকাশ বা প্রচার নিষিদ্ধ করে দেয়। উল্লেখ্য: গান্ধীজি বা জওহারলালের কলমে এমন কোনো গ্রন্থ লেখা হয়নি যেটাকে শাসক সম্প্রদায় নিষিদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে।

১৯৩৬-এ জার্মানিতে অবস্থানকালে সুভাষচন্দ্র জার্মানীর বিদেশ দপ্তরের কাউন্সিলার মিঃ ভাইকফকে একটি প্রতিবাদপত্র লেখেন—নাৎসী জার্মানীর ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিবাদ। একই সময়ে ডঃ থিয়েরফেলডারকে একটি পত্রাঘাত করেন, হের হিটলারের জাতিবৈষম্য তথা ইহুদী-বিদ্বেষ নীতির প্রতিবাদ জানিয়ে। এই দুটি পত্রের ফোটোকপি এলগিন রোডে 'নেতাজি ভবনে' সুরক্ষিত। পরবর্তীকালে নিরাপদ দুরত্বে বসে যাঁরা 'ফ্যাসীবাদ মুর্দাবাদ' বুলি কপচেছেন তাঁরা কি কল্পনা করতে পারেন যে, জার্মানীর বুকে বসে ওই সময়ে সে জাতীয় প্রতিবাদ লিখতে হলে কতটা হিম্মতের প্রয়োজন হয়?

যে কথা বলছিলাম: প্রায় তিন বছর ইউরোপে কাটিয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন সম্বন্ধে প্রচার করে সুভাষ স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন উনিশশো ছত্রিশ সালে। জওহারলাল তখন গান্ধীজির আশীর্বাদে কংগ্রেস সভাপতি। ভারত সরকার তৎক্ষণাৎ সুভাষকে নিষেধ করলেন মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন করার প্রচেষ্টায়। সুভাষ ভ্রূক্ষেপ করলেন না। ইতালি থেকে 'এম. এম. কান্দে ভেরদে' জাহাজযোগে ভারত অভিমুখে রওনা হলেন।

এপ্রিলের আট তারিখ জাহাজ বোম্বাই পৌঁছল। ভারতভূমিতে পদার্পণমাত্র তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল। জওহারলাল তখন নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভাপতির আসনে দ্বিতীয়বার অধিষ্ঠিত হয়েছেন। ওয়ার্কিং কমিটি ব্যস্ত হয়ে পড়ল। নিজের মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তনের অপরাধে ব্রিটিশ সরকার সুভাষকে বন্দি করার জন্য একটা প্রতিবাদ বা যাহোক একটা কর্মসূচি গ্রহণ না করলে ভাল দেখায় না। কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট জওহারলাল সিদ্ধান্ত নিলেন একটা 'অল ইন্ডিয়া সুভাষ ডে' পালন করা হোক। সবাই সেদিন কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের ফতোয়া অনুযায়ী 'সুভাষ দিবস' পালন করল। পরম করুণাময় ঈশ্বরের কাছে সুভাষচন্দ্রের কারাগার থেকে আশুমুক্তি কামনা করল। এর চেয়ে বেশি আর কী করা যেত বলুন?

ক্রমাগত কারাবাস, নির্বাসন, অন্তরীণ থাকার ফলে পুরো দুটি বছর—উনিশশো ছত্রিশ ও সাঁইত্রিশ সালে—দৈহিকভাবে সুভাষ ছিলেন অশক্ত। ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য এই সময় ডঃ ধর্মবীরের আমন্ত্রণে কিছুদিন ডালহৌসিতে বাস করেন। শয্যাশায়ী হলে কি হয়, মস্তিষ্কের বিরাম নেই। 'কম্যুনাল অ্যাওয়ার্ড'-এর বিরুদ্ধে তখনও তিনি জনমত সংগ্রহের চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

আজকের দিনের পাঠকের জন্য কিছু পূর্বকথন বোধ করি আবশ্যিক—নাহলে ওই 'কম্যুন্যাল অ্যাওয়ার্ড' জিনিসটা বোঝা যাবে না।

উনিশশো একত্রিশ সালে গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে সুভাষচন্দ্র জেল থেকে মুক্তি পেলেন এবং গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করতে বোম্বাই গেলেন। ওই চুক্তি যে দেশের পক্ষে কল্যাণকর হয়নি একথা গান্ধীজিকে স্পষ্ট করে বললেন। গান্ধীজি বলেছিলেন, কিন্তু ওই চুক্তির সুযোগেই তো তুমি আজ আমার সঙ্গে কথা বলতে পারছ। সুভাষ নাকি প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন, 'আমার জেল থেকে মুক্তি পাওয়াটা বড় কথা নয়, ওই চুক্তিতে কিন্তু লাহোর সেন্ট্রাল জেলে ভগৎ সিং, সুখদেব, আর রাজগুরুর ফাঁসি আটকান যায়নি।' গান্ধীজি হয়তো প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন, অথবা বলেননি—ওরা তিনজন অহিংস যোদ্ধা ছিল না।

সুভাষ এর পর পূর্ববঙ্গে যান; একটি সভায় গান্ধীজির গোলটেবিল বৈঠক ও গান্ধী-আরউইন চুক্তির কঠোর সমালোচনা করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, ইংরেজ একইভাবে আয়ার্ল্যান্ডের স্বাধীনতাকামী সিনফিন দলের সঙ্গে গোলটেবিল বৈঠক করতে চেয়েছিল। সিনফিন দলনেতা ইমন ডি ভ্যালেরা ইংরেজের ফাঁদে পা দেননি। উনিশশো একত্রিশ সালের শেষাশেষি দ্বিতীয়বার গোল টেবিল বৈঠক সেরে গান্ধীজি যখন বোম্বাই এসে পৌঁছন (পাঁচই ডিসেম্বর) তখন সুভাষচন্দ্র জাহাজঘাটায় তাঁকে স্বাগত জানাতে গিয়েছিলেন।

মাসখানেকের মধ্যে বস্তুত ২.১.৩২ তারিখে সুভাষকে বোম্বাই মেল-এ গ্রেপ্তার করা হয়, কল্যাণ রেল স্টেশনে যখন গাড়ি দাঁড়ায়। একবছরের ওপর কারাবাস করে ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণে সুভাষচন্দ্রকে পুনরায় ইউরোপ যাত্রার অনুমতি দেওয়া হয়। ২৩.২.৩৩ তারিখে এস এস গঙ্গা জাহাজে বোম্বাই থেকে রওনা হলে সরকারীভাবে তাঁকে সাময়িকভাবে মুক্ত বলে ঘোষণা করা হয়। ওই 'সাময়িকভাবে' শব্দটির অজুহাতে তিনবছর পরে তিনি ফিরে এসে মাতৃভূমিতে পদার্পণমাত্র তাঁকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

উনিশশো তেত্রিশ সালের মার্চ মাসে সুভাষচন্দ্র ভিয়েনায় পৌঁছন। ওই সময়েই (১৭.৮.৩২) র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড প্রস্তাবিত 'কম্যুনাল অ্যাওয়ার্ড বা 'সাম্প্রদায়িক

বাঁটোয়ারা'র প্রস্তাবে কিছুটা স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়ার চেষ্টা করে ইংরেজ সরকার। অধিকাংশ কংগ্রেসী নেতা এই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে ছিলেন। মালব্যজী, আনে, পার্শী নেতা নরীম্যান প্রভৃতি ছিলেন এর বিরুদ্ধে। বস্তুত এ নিয়ে ভারতব্যাপী প্রতিবাদ ও আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু গান্ধীজি এই আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। তাঁর মতটা ছিল neither accept nor reject বা 'না গ্রহণ, না বর্জন' নীতি। সুভাষচন্দ্র তখন ভিয়েনায়। সেখানে তখন ছিলেন সর্দার বল্লভভাইয়ের দাদা বিঠলভাই প্যাটেল। দুজনে মিলিতভাবে একটি যৌথ ম্যানিফেস্টো তৈরি করে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট ও গান্ধীজিকে পাঠিয়ে দেন। এর ঐতিহাসিক নাম 'বোস-প্যাটেল ম্যানিফেস্টো'। তাতে বলা হয়েছিল: বিদেশী সরকার ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামকে দ্বিধাবিভক্ত করতে চাইছে—হিন্দু-ভারত ও মুসলমান-ভারত।

কী অপরিসীম দূরদর্শিতা! এই ম্যানিফেস্টো রচিত হয়েছিল ভারত-বিভাগের চৌদ্দ বছর আগে! দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষের, জাতির পিতা এই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা প্রত্যাখ্যান করেননি। না গ্রহণ-না বর্জন নীতি মেনে নিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে আরও জানাই, বিঠলভাই প্যাটেল এই ম্যানিফেস্টো রচনার মাসপাঁচেক পরে জেনিভাতে পরলোকগমন করেন (২২.১০.৩২)। মৃত্যুর সময়ে তাঁর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন মাত্র চারজন ভারতীয়। তার মধ্যে একজন সুভাষচন্দ্র।

এর মাস দুয়েক পরে (৫.১২.৩২) বিঠলভাইয়ের উইলটি প্রকাশিত হয়। তাতে দেখা যায় তিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে একনিষ্ঠ সেবক সুভাষচন্দ্র বসুকে এক লক্ষ টাকা নগদে দান করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বিঠলজীর ওই উইলটি নিয়ে পরবর্তীকালে মামলা হয়। বিঠলজীর অনুজ বল্লভভাই ছিলেন পেশায় উকিল—ফলে সুভাষচন্দ্র বিঠলজীর শেষ ইচ্ছানুযায়ী এক কপর্দকও পাননি।

★ ★ ★

যে কথা বলতে বলতে প্রসঙ্গান্তরে চলে গেছি, সেই মূল স্রোতে ফিরে আসা যাক। উনিশশো সাঁইত্রিশ সালের মার্চ মাসে বাংলার তৎকালীন গভর্নর অ্যান্ডারসনের সুপারিশক্রমে ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণে সুভাষকে আবার মুক্তি দেওয়া হল। হয়তো কংগ্রেস সভাপতি জওহারলাল 'সারা ভারত সুভাষ দিবস' পালনের আহ্বান জানানোর ফলে সবাই করুণাময় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করার সুযোগ পায়। তাই গভর্নর সাহেব বদান্য হয়ে ওঠেন।

সদ্যমুক্ত সুভাষচন্দ্রকে সংবর্ধনা জানানোর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক বিরাট জনসভার আয়োজন করা হয়। পার্কে, চারপাশের রাস্তায়, আশপাশের বাড়ির বারান্দা

ও ছাদে তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না। সবাই তাদের প্রিয় রাজপুত্রকে দেখতে চায়। ছয়শতটি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাঁকে মাল্যভূষিত করতে এত ফুলের মালা এনেছিল যা পর্বতপ্রমাণ হয়ে ওঠে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে একটি আশীর্বাদবাণী পাঠিয়েছিলেন।

ওই সাঁইত্রিশ সালের দোসরা অক্টোবর মহাত্মাজির জন্মদিনে কলকাতায় প্রথম প্রকাশিত হয় একটি ইংরেজি দৈনিক : হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড। প্রথম দিনের পাতাতেই সংবাদ ছিল—আগামী হরিপুরা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র সর্ববাদীসম্মতিক্রমে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হতে চলেছেন। পরে তাই তিনি হয়েছিলেন, একথা সকলেই জানেন। কিন্তু বুড়ো ইতিহাস যে কথাটা লিখে রাখতে ভুলেছে তা প্যাটেলকে লেখা গান্ধীজির একটি চিঠি (১.১১.১৯৩৭) : 'সুভাষকে এতবড় দায়িত্ব দেওয়ার ইচ্ছা আমার আদৌ ছিল না। তাকে যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করি না আমি। কিন্তু সদ্য কারামুক্ত সুভাষ ছাড়া সভাপতি হবার মতো জনপ্রিয় নেতা আর তো কাউকে নজরেও পড়ছে না।'[L. A. Gordon : Brothers Against the Raj, P. 340] সুভাষচন্দ্র এই সময়ে পুনরায় ইউরোপে। আঠারই জানুয়ারি (১৯৩৮) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সম্পাদক আচার্য কৃপালনী ঘোষণা করেন, গুজরাটের হরিপুরা কংগ্রেসে বাহান্নতম অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সভাপতিরূপে নির্বাচিত হয়েছেন। গান্ধীজি ওই একই দিনে সুভাষচন্দ্রকে বিলেতে টেলিগ্রাম করেন, 'ভগবান তোমাকে জওহারলালের হাত থেকে আলোকবর্তিকা বহনের শক্তি দিন।'

আক্ষরিক অর্থে সুভাষ সভাপতিরূপে জওহারলালের 'সাকসেসার'। সুতরাং রিলে রেসের প্রতিযোগীর মতো জওহারলালের হাত থেকেই 'আলোকবর্তিকা' তাঁকে গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু ইংরেজি ভাষায় যাঁর অসাধারণ অধিকার, মানবচরিত্র যিনি খুব ভালভাবেই বোঝেন, সেই গান্ধীজির পক্ষে টেলিগ্রামের ভাষাটা কি একটু অন্যরকম হতে পারত না?

এখানে আরও বলি, সম্পাদক আচার্য কৃপালনী যখন সরকারিভাবে জানালেন যে, সুভাষচন্দ্র এবার সভাপতি হচ্ছেন তখনই তিনি প্রাগবর্তী সভাপতি জওহারলালকে একটি চিঠি লিখেছিলেন, 'আমি এখন জাতীয় কংগ্রেসের সম্পাদকপদ থেকে অব্যাহতি পেতে চাই। কারণ আসন্ন প্রেসিডেন্ট সুভাষচন্দ্রকে আমি আদৌ সহ্য করতে পারি না। আপনি অনুমতি দিলে আমি পদত্যাগপত্র পেশ করতে ইচ্ছুক।' (তদেব, পৃঃ ৩)

এ থেকে প্রমাণিত হয়, হরিপুরা কংগ্রেসে প্রথম থেকেই সুভাষকে কাঁটার মুকুটে সুশোভিত করার আয়োজন করছিল দক্ষিণপন্থী মডারেটরা। সুভাষ বিলেতে বসে গান্ধীজির টেলিগ্রাম পেলেন। জানুয়ারির আঠার তারিখে। তার দুদিন পূর্বে তিনি

আয়ারল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট ইমন ডি ভ্যালেরার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ভারত ও আয়ারল্যান্ডের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে উভয়ের বিস্তারিত আলোচনা হয় (১৬.১.১৯৩৮); এবং তার আগের সপ্তাহে (১১.১.১৯৩৮) লন্ডনের সেন্ট প্যানক্রাস টাউন হলে রজনী পাম দত্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ভারতীয়দের একটি সভায় সুভাষ ভারতের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের পারস্পরিক সম্বন্ধ নিয়ে একটি ভাষণ দিয়েছিলেন।

ক্রয়ডন থেকে আকাশপথে ভারত অভিমুখে রওনা হলেন সুভাষ। প্রাগে নেমে সাক্ষাৎ করলেন চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রেসিডেন্ট ডঃ বেনেসের সঙ্গে এবং মিলানে গোপনে সাক্ষাৎ করেন সিনর মুসোলিনীর সঙ্গে। শেষোক্ত ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর আদৌ সাক্ষাৎ হয়েছিল কি না, হয়ে থাকলে কী জাতীয় কথাবার্তা হয়েছিল তার কোনো রেকর্ড নেই।

গুজরাটের হরিপুরায় জাতীয় কংগ্রেসের বাহান্নতম অধিবেশন হল ফেব্রুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে। দীর্ঘ ভাষণের শেষে সুভাষ বললেন, 'আমাদের লক্ষ্য শুধু ভারতের মুক্তি নয়, নিপীড়িত সমগ্র মানবজাতির মুক্তি।' সভাপতি যখন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণা করলেন তখন দেখা গেল অনেক নতুন বামপন্থী প্রগতিবাদী সদস্য হয়েছেন। চিরাচরিত বৃদ্ধদের অবসর নেবার সুযোগ দিয়েছেন নবীন সভাপতি। হরিপুরা কংগ্রেসের আর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলি। এখানে কংগ্রেস সভাপতির জন্য বরাদ্দ ছিল একটি গো-শকট। একান্নটি বলদ ওই গো-যানটিকে মণ্ডপের দিকে টেনে নিয়ে যায়। আমেরিকার 'টাইম্‌স' ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদে সেই বিচিত্র শোভাযাত্রার রঙিন আলোকচিত্র মুদ্রিত হয়। এর আগে বা পরে কংগ্রেসের কোনো অধিবেশনের ছবি ওই বিশ্ববিখ্যাত পত্রিকার প্রচ্ছদ হিসাবে মুদ্রিত হয়নি।

সুভাষচন্দ্র জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হবার সঙ্গে সঙ্গে জাপান থেকে মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু, যিনি ইংরেজ গোয়েন্দাদের ফাঁকি দিয়ে ১৯১৫ সাল থেকে জাপানে বসবাস করছেন—সুভাষকে একটি পত্র লেখেন। প্রাপক সে চিঠি হাতে পাননি। মাঝপথে ব্রিটিশ গোয়েন্দার দল চিঠিখানি ছিনতাই করে। বর্তমানে অবশ্য জাতীয় মহাফেজখানায় পত্রটি সুরক্ষিত। চিঠিতে রাসবিহারী সুভাষচন্দ্রকে লিখেছিলেন, 'সমাজসেবা অথবা ধর্মের নিক্তিতে অহিংসার কিছু ওজন মানব-সংস্কৃতিতে থাকতে পারে, কিন্তু কোনও পরাধীন জাতির মুক্তি-সংগ্রামে তার কোনো ভূমিকা নেই। যে কোনো পন্থায় ভারতকে স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে; তা সে হিংসার পথেই হোক অথবা অহিংসার। সোজা কথায়, অহিংসামন্ত্র ভারতীয় পৌরুষকে নির্বীজ করে তুলেছে। তুমি কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হয়েছ। এখন কংগ্রেসকে এমনভাবে পরিচালিত কর যাতে মূল লক্ষ্য হবে সামরিক প্রস্তুতি। সেটাই স্বাধীনতাতীর্থের সোপান।'

এ থেকে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়, মহাবিপ্লবী রাসবিহারী সুদূর জাপানে বসে সুভাষচন্দ্রের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রেখেছিলেন।

ভারতবাসী হিসাবে লজ্জায় মাটিতে মিশে যাই যখন মনে পড়ে এই রাসবিহারীর শেষ ইচ্ছাটুকু স্বাধীন ভারত পঞ্চাশ বছরের ভিতরে পূর্ণ করেনি—সামান্য ইচ্ছা, 'আমার মৃত্যু পর আমার চিতাভস্ম যেন স্বাধীন ভারতের গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া হয়।' (রাসবিহারীর চিতাভস্ম আজও জাপানে পড়ে আছে)।

১৯৩৮ সাল। সভাপতি নির্বাচিত হবার পর মাসখানেকও অতিবাহিত হয়নি। সুভাষচন্দ্র সংবাদ পেলেন, অর্থসংগ্রহ মানসে রবীন্দ্রনাথ কিছু নাট্যাভিনয়ের প্রচেষ্টা করছেন। না হলে অর্থাভাবে তাঁর শান্তিনিকেতন চালানো কষ্টকর হয়ে পড়েছে। সুভাষ চলে এলেন কলকাতায়। মাণিকতলার 'ছায়া' সিনেমাহলে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে 'চণ্ডালিকা' মঞ্চস্থ করা হয়। উদ্বোধন রজনীতে নবনির্বাচিত কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্রও উপস্থিত ছিলেন।

এর কিছুদিন পরেই সুভাষ বিলেতে ভ্রমণকারী জওহারলালকে একটি পত্র লেখেন—'ইউরোপের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে একটা চরম পরিণতি আসন্ন। বিশ্বযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। অতএব ইংরেজ সরকারের কাছে পূর্ণ স্বরাজ দাবি করার এটাই হচ্ছে সুবর্ণ সুযোগ। আপনার এবং আপনার সহযোগী গান্ধীবাদীদের কার্যকলাপ দেখে তো মনে হয় না, আপনারা দেশের স্বাধীনতার জন্য এই সুযোগ কাজে লাগাতে আগ্রহী। পত্রোত্তরে আপনাদের অভিমত জানান'।

জওহারলাল এ পত্রের কী জবাব দিয়েছিলেন, আদৌ কোনো জবাব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন কি না, জানি না।

মে মাসে মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে সুভাষচন্দ্র একটি সর্বভারতীয় জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার কথা বলেন। আমরা যাকে আজ 'প্ল্যানিং কমিশন' বলি তার জন্ম হয়েছিল এইভাবে। অনতিবিলম্বে তিনি সর্বভারতীয় পরিকল্পনার কমিশন (প্ল্যানিং কমিশন) গঠন করেন। কংগ্রেস শাসিত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শিল্পমন্ত্রীদের নিয়ে প্ল্যানিং কমিশনের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। সভাপতিত্ব করলেন সুভাষচন্দ্র স্বয়ং। জওহারলাল তখনও ইউরোপে। স্পেনে। সুভাষচন্দ্র জওহারলালজিকে সেখানে টেলিগ্রাম করলেন, প্ল্যানিং কমিশনের চেয়ারম্যানের পদ অলঙ্কৃত করতে। জওহার এককথাতেই রাজি হয়ে গেলেন। প্রসঙ্গত 'ডিসকভারি অব ইন্ডিয়ায়' জওহারলাল লিখেছেন যে, প্রথম প্ল্যানিং কমিশনে তিনি সভাপতি হয়েছিলেন। কিন্তু কীভাবে তিনি এই গদিতে চড়ে বসেন, সে কথা উহ্য রাখেন।

মাত্র এক বছরের মধ্যে কংগ্রেসের অনেক প্রভাবশালী নেতা সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে আপসবিরোধী হয়ে উঠতে থাকেন। তাঁরা বুঝতে পারছিলেন বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন। এই হচ্ছে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সুবর্ণ সুযোগ। মনে রাখতে হবে যে, ১৯৩৬ সালের অক্টোবরে 'রোম-বার্লিন অ্যাক্সিস' গড়ে উঠেছিল। দুই বছরের ভিতরে সুভাষ যখন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট—তখন হিটলার অস্ট্রিয়া অভিযান করে, 'সুডেটেন' অঞ্চল চেকোশ্লোভাকিয়ার হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়। সেপ্টেম্বর ১৯৩৮-এ মিউনিক চুক্তি অনুসারে হিটলারের এই আগ্রাসী দাবি মেনে নিতে বাধ্য হল ব্রিটেন ও ফ্রান্স। ব্রিটেনের সে সময় 'শিরে সংক্রান্তি'।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ধুরন্ধর সুভাষ প্রণিধান করলেন জার্মানীর হিটলার ক্রমে বিশ্বত্রাস হয়ে উঠছে। ব্রিটেন চূড়ান্তভাবে অপ্রস্তুত। এদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রত্যাসন্ন। এই সময়ে কংগ্রেস যদি পূর্ণ স্বরাজ দাবি করে ছয়মাসের নোটিস জারি করে বসে, তাহলে 'ঘরে-বাইরে' শত্রুর দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হতে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট তৎক্ষণাৎ কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা করতে বাধ্য হবে। দমননীতি চালাতে সাহস পাবে না। কারণ ভারতবর্ষই হচ্ছে অর্থনৈতিক বিচারে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের সবচেয়ে মজবুত স্তম্ভ। সুভাষ এই সময় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের দোরে দোরে, গান্ধীজি আর জওহারলালের কাছে বললেন একটা সর্বভারতীয় আন্দোলন গড়ে তুলতে, ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে পুনরায় ছয় মাসের চরমপত্র দেওয়া হোক। যেমন দেওয়া হয়েছিল ১৯২৯-এ। ভারতের চরম দুর্ভাগ্য : জাতির জনক মোহনদাস করমচাঁদ সেদিন এ-প্রস্তাবে রাজি হতে পারলেন না। আর যেহেতু মোতিলালের মহাপ্রয়াণে মোহনদাসই জওহারলালের নতুন 'ক্রাচ', তাই তিনিও সুভাষের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। কংগ্রেসের তাবড় তাবড় চাঁইয়েরা —প্যাটেল, আজাদ, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, রাজাগোপালাচারীর দল—বললেন, বাপুজি যখন বারণ করেছেন তখন ব্রিটেনকে এই দুর্যোগ মুহূর্তে বিব্রত করা ঠিক হবে না। তাছাড়া কথায় বলে : সবুরে মেওয়া ফলে।

এখানে আমাদের বিচার করে দেখতে হবে : হেতুটা কী ? ধুরন্ধর রাজনীতিক গান্ধীজি কি বুঝতে পারলেন না সুভাষের প্রস্তাবটা কী প্রচণ্ড সময়োপযোগী ? অথচ ঠিক ওই একই প্রস্তাব তিনি গ্রহণ করলেন মাহেন্দ্রক্ষণ অতিবহিত হয়ে যাবার পাক্কা চার বছর বাদে। ৯.৮.১৯৪২ তারিখে : 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'—QUIT INDIA।

সুভাষচন্দ্র যে মাহেন্দ্রক্ষণে 'কুইট ইন্ডিয়া' প্রস্তাব কংগ্রেসকে দিয়ে পাস করাতে চেয়েছিলেন—১৯৩৮ সালের শেষাশেষি তখনও বিশ্বযুদ্ধ বাধেনি—তখনও আমেরিকা অথবা রাশিয়া কোন পক্ষে যোগ দেবে জানা নেই। ব্রিটিশ সিংহের ল্যাজ পেটের ভিতর গুটানো, চেম্বারলেনের ছাতা ঝড়ের ঝাপ্টায় উল্টে গেছে। আর গান্ধীজি যখন তার চার বছর পরে সবুরে মেওয়া ফলেছে কি না যাচাই করতে

চাইলেন—বিয়াল্লিশের আন্দোলন—ততদিনে চুরুটমুখো চার্চিলের একপাশে কমরেড স্ট্যালিন অপরপাশে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট। 'ভারত ছোড়' হুঙ্কার দেবার আগেই—কংগ্রেসে প্রস্তাব গৃহীত হবার আগেই—নাঙ্গা ফকিরকে প্রিজন ভ্যানে উঠিয়ে নিতে বিলম্ব করেনি ব্রিটিশ সিংহ। মেদিনীপুরে আর বালিয়ায় বেঘোরে মারা গেলেন অসংখ্য গান্ধীবাদী মাতঙ্গিনী হাজরার দল। গান্ধীজি তখন য়ারবেদা জেলে বসে চরকা কাটছেন; জওহার 'ডিস্‌কভারি অব ইন্ডিয়া' রচনার জন্য জেলারকে ইতিহাস বইয়ের লিস্ট ধরিয়ে দিচ্ছেন।

গান্ধীবাদীরা আমাকে মার্জনা করবেন—আমার সুচিন্তিত অভিমত : গান্ধীজি যদি তাঁর জীবনে কোনও 'হিমালয়ান ব্লান্ডার' করে থাকেন, তবে সেটা চৌরিচৌরায় নয়, ১৯৩৮-এ। যখন সুভাষচন্দ্রের তারুণ্যকে, তাঁর স্বপ্নকে তিনি সহ্য করতে পারেননি। ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি জনযুদ্ধের জিগির তুলে অন্য কারণে ইংরেজ শাসনকে স্বীকার করে নিয়েছিল, কিন্তু গান্ধীজি কেন ১৯৩৮ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত তাই করলেন? সুভাষচন্দ্রের 'মেয়াদ' শেষ হয়ে এল। সামনে ত্রিপুরী কংগ্রেস। কে হবেন নতুন কংগ্রেস সভাপতি? গান্ধী-জওহারের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও অদম্য সাহসে সুভাষ বললেন, 'আমি নিজে দ্বিতীয়বারের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব, যদি না সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হই।'

বামপন্থী দুইজন বিশিষ্ট নেতা, জয়প্রকাশ নারায়ণ এবং স্বামী সহজানন্দ ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্বাচন সমর্থন করে একটি যৌথ বিবৃতি দিলেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে গান্ধীজিকে তারবার্তা পাঠালেন সুভাষচন্দ্রকে পুনর্নির্বাচিত করতে। গান্ধী উত্তরে জানালেন, 'সুভাষের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় না দাঁড়ানোই বাঞ্ছনীয়।' গান্ধীজি এই পর্যায়ে মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে অনুরোধ করেন সুভাষের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে। আজাদ ধুরন্ধর রাজনীতিক। তিনি অস্বীকৃত হন। তখন গান্ধীজি মরিয়া হয়ে নেহরুকে চিঠিতে লেখেন, 'মৌলানা সাহেব কাঁটার মুকুট মাথায় পরতে নারাজ। তুমি যদি চাও তাঁকে রাজি করাবার চেষ্টা করতে পার। মৌলানা আমার অনুরোধ শোনেননি, তোমার কথাও না শুনলে আমি তোমাকে চতুর্থবার সভাপতি হবার জন্য আহ্বান করছি। তুমিও যদি না শোন, তাহলে পট্টভি সীতারামাইয়া ছাড়া দ্বিতীয় আর কোনো লোক নেই।'

কে একজন বুঝি মৌলানা আজাদের নাম কংগ্রেস সভাপতির নির্বাচন পদপ্রার্থী হিসেবে প্রস্তাব করে। মৌলানা ২০.১.১৯৩৯ তারিখে নিজ নাম প্রত্যাহার করে নেন। তাঁর পাঁচ দিন পরে গান্ধী ও জওয়াহরলালের সঙ্গে আলোচনার পর সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দেন 'আসন্ন কংগ্রেস অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র বসুর পুনর্নির্বাচন দেশের পক্ষে ক্ষতিকর হবে।'

সুভাষ সংবাদপত্রের জবাবে বলেন, 'এটি একটি বহুল প্রচারিত বিশ্বাস যে, আগামী বছর কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী দল ও ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে একটা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো বা ফেডারেশন স্কীম নিয়ে সমঝোতার পরিকল্পনা রয়েছে। সেটা ভারতের পক্ষে মর্যাদাহানিকর। কারণ তাতে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার স্বপ্ন চিরকালের মতো ব্যর্থ হবে।'

কংগ্রেসের ইতিহাসে সভাপতির পদের জন্য কোনোদিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়নি। চিরকালই গান্ধীজির মনোনীত প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গদিতে উঠে বসেছেন। অন্তত গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে আসার পর। অথচ মজার কথা গান্ধীজি কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্য পর্যন্ত ছিলেন না। তাঁর ভাষায় 'আই অ্যাম নট এ ফোর আনা মেম্বার অব দ্য কংগ্রেস।' এদিকে নেহরুর ভাষায় 'কংগ্রেস আর গান্ধীজি সমার্থক শব্দ।' সেই গান্ধীজির নির্দেশ ও ইচ্ছাকে উপেক্ষা করে সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয়বার সভাপতি পদের জন্য নির্বাচনে দাঁড়ালেন। ইতিহাস রচিত হল ত্রিপুরীতে। গান্ধীজির আশীর্বাদধন্য পট্টভি সীতারামাইয়া পেলেন ১,৩৭৫টি ভোট এবং সুভাষচন্দ্র ১,৫৮০টি ভোট। ২০৫ ভোটের ব্যবধানে সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয়বার সভাপতি নির্বাচিত হলেন। এবং পরের দিনের সংবাদপত্রেই আমরা দেখলাম জাতির জনক পুনরায় 'হিমালয়ান ব্লান্ডার' করে বসে আছেন ! তিনি সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে বসলেন, 'পট্টভি সীতারামাইয়ার পরাজয় আমারই পরাজয়'।

কেন? গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কংগ্রেসের ওই ভোটের বাজারে জাতির জনক তো 'হরিদাস পালের' অধিকারটুকুও দাবি করতে পারেন না। কারণ হরিদাসের একটা ন্যায্য ভোট থাকে। গান্ধীজির তা ছিল না—চার আনার সদস্য না হওয়ায়। তাহলে এটা কী জাতীয় মনোভাব? 'কর্তার ইচ্ছায় কম্মো' জমিদারী সেরেস্তায় হয়ে থাকে, হিটলারের জামানী বা মুসোলিনীর ইতালীতে হয়ে থাকে—ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে তা হবে কেন? এক ব্যক্তি কংগ্রেসে একাধিকবার সভাপতি হয়েছেন। ত্রিপুরী কংগ্রেসের পূর্বে তিন তিনবার (১৯২৯, ১৯৩৫, ১৯৩৭) জওহারলাল হয়েছেন। স্বাধীনতার পরে আরও তিনবার (১৯৫১, ১৯৫৩, ১৯৫৪) হয়েছেন। কেউ কখনও আপত্তি করেনি। তাহলে গণতান্ত্রিক বৈধ নির্বাচনে সুভাষচন্দ্র জয়লাভ করলে গান্ধীজি কোন অধিকারে মনে করবেন যে, পরাজয়টা তাঁর?

দ্বিতীয় কথা : ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ এবং বাকসংযমী মোহনদাস ওই সঙ্গে আর একটি বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন, বোধ করি সেটাই তাঁর সত্যাশ্রয়ী দীর্ঘ জীবনে হীনতম উক্তি। অত্যন্ত অসংযমী দুর্বিনীত বালভাষ : আফটার অল, সুভাষ ইজ নট অ্যান এনিমি অফ দ্য কান্ট্রি (যত যাই হোক, সুভাষ তো আর দেশের শত্রু নয়)!

এটাকে বলে সংসদীয় পদ্ধতিতে গাল পাড়া ! মনের ঝাল ঝাড়া ! পট্টভির পরাজয়কে গান্ধীজি যে শান্ত-সমাহিত চিত্তে গ্রহণ করতে পারবেন না, রাম-শ্যাম-যদুর মতো পার্লামেন্টারি পদ্ধতিতে খিস্তি ঝাড়বেন, এটা ছিল আমাদের চিন্তার বাইরে। এ উক্তিটি সংবাদপত্রে যখন প্রথম পাঠ করি তখন আমি স্কুলের ছাত্র। বয়স চোদ্দ, আর আজ আটাত্তর। দীর্ঘ চৌষট্টি বছরেও কিন্তু গান্ধীজির এই অসংযমী উক্তির কোনো যুক্তি কোনো যাথার্থ্য খুঁজে পাইনি!

'আফটার অল' শব্দদ্বয় কেন যুক্ত হল বাক্যের প্রথমে? সুভাষ তো দেশের 'শত্রু নয়' বলেই পরাজিত মহাত্মা কি শান্ত হতে পারলেন না? 'আফটার অল' শব্দদ্বয়ের তো সম্ভাব্য গূঢ় ব্যঞ্জনা—'ওর দেশদ্রোহিতার ব্যাপার-স্যাপার তো আপনারা সবাই জানেনই।' ছিঃ !

আর 'শত্রু নয়'? সুভাষচন্দ্র! গান্ধীজির জিহ্বা উচ্চারিত শব্দ? যে গান্ধীজি হামেহাল মৌন থাকতেন, স্লেটে জবাব লিখে দিতেন, সেই বাকসংযমী মহাত্মার উক্তি—সুভাষ শত্রু নয়! এই মহাত্মাজির সঙ্গে জীবনে চারবার প্রার্থনাসভায় যোগ দিয়েছি। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে তাঁর সঙ্গে গলা মিলিয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করার সৌভাগ্য এ অধম লেখকের চার-চারবার হয়েছে : দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ। বীতরাগ-ভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে।।' (দুঃখে যিনি উদ্বিগ্ন হন না, সুখে নিস্পৃহ, যিনি আসক্তি ও ভয়শূন্য সেই ক্রোধরহিত মুনিই স্থিতপ্রজ্ঞ বলে গণ্য হন।)

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোটের মাধ্যমে একটি নির্বাচন হল; 'রিগিং' হয়নি, 'ছাপ্পাভোট' পড়েনি; দুজন প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে একজন জয়ী হলেন। সেই অপরাধে তিনি হয়ে গেলেন 'আফটার অল দেশের শত্রু নন?' কেন? না, যেহেতু তিনি এমন একজন লোকের পছন্দসই প্রার্থী নন, যিনি স্বয়ং কংগ্রেসের চার-আনা সদস্যও নন!

সুভাষচন্দ্র গান্ধীজির এই কটূক্তির কোনো প্রতিবাদ করেননি। প্রত্যুত্তরও করেননি। কারণ সুভাষচন্দ্র ছিলেন গীতাবর্ণিত স্থিতপ্রজ্ঞ! যদিও তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যায় সাড়ম্বরে জনসভায় 'গীতা' আওড়াতেন না।

নির্বাচিত সভাপতি সুভাষচন্দ্র নেতৃস্থানীয় কংগ্রেসী সদস্যদের নিয়ে কার্যকরী সমিতি (ওয়ার্কিং কমিটি) গঠন করতে বসলেন। কিন্তু তাবড় তাবড় গান্ধীপন্থী কংগ্রেস চাঁইরা একযোগে পদত্যাগ করলেন। প্রাগবর্তী ওয়ার্কিং কমিটির দুজন মাত্র এই ষড়যন্ত্রে সামিল হননি। সভাপতি স্বয়ং এবং তাঁর দাদা শরৎচন্দ্র বসু। এমনকি জওহারলাল নেহরু, যাঁকে সুভাষচন্দ্র তাঁর দাদা শরৎচন্দ্রের মতো সম্মান করতেন — তিনিও মুখ ফিরিয়ে নিলেন! সুভাষ এসে দেখা করলেন গান্ধীজির সঙ্গে। গান্ধীজিকে বোঝাতে চাইলেন — নির্বাচনে জয়লাভ করা কোনোও অপরাধ নয়। গান্ধীজি তাঁর অনুরোধে কোনো সাড়াই দিলেন না।

সহযোগীদের দলগত অসহযোগিতায় সুভাষ বাধ্য হয়ে সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিলেন (৮.৪.১৯৩৯)। রবীন্দ্রনাথ তখন পুরীর সমুদ্রতীরে। সংবাদপত্র পাঠান্তে রবীন্দ্রনাথ সুভাষকে তৎক্ষণাৎ টেলিগ্রাম করলেন, 'অত্যন্ত বিরক্তিকর এবং উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিতে নিমগ্ন হয়েও তুমি যে ধৈর্য ও আত্মমর্যাদার সাক্ষর রেখেছ তাতে তোমার নেতৃত্বের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।'

সুভাষচন্দ্র পদত্যাগ করা সত্ত্বেও প্রতিহিংসাপরায়ণ কংগ্রেসের চাঁইয়ের দল শান্ত হওয়া তো দূরের কথা আরও নির্লজ্জের মতো ব্যবহার শুরু করলেন। এতবড় আস্পর্ধা! গান্ধীজির বিরোধিতা করে নির্বাচনে জয়ী হওয়া! সুভাষকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির (বি.পি.সি.সি.) সভাপতির পদ থেকেও বিতাড়ন করা হল। তাঁর বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করা হল তিন বছরের জন্য তিনি কোনও নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবেন না!

কেন? গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জয়লাভ করা কি এতই বড় অপরাধ? নাকি 'নট আ ফোর আনা মেম্বারের' নির্দেশ অগ্রাহ্য করা? প্রতিবাদ জানালেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ—ওই চার আনা চাঁদা না দিয়ে যিনি কংগ্রেসের অ-সভ্য হয়ে স্বৈরতন্ত্র পরিচালনা করছেন সেই গান্ধীজিকে। অনুরোধ করলেন, এই অগণতান্ত্রিক আদেশটি প্রত্যাহার করে নিতে। গান্ধীজি জবাবে জানালেন, নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা অসম্ভব।

দীনবন্ধু অ্যান্ড্রুজও শান্তিনিকেতন থেকে পৃথকভাবে একটি আর্জি পাঠিয়েছিলেন গান্ধীজিকে। গান্ধীজি তাঁকে জানালেন 'সুভাষ পরিবারের আদরে নষ্ট ছেলের মতো (স্পয়েল্‌ড চাইল্ড) আচরণ করছে। তার সঙ্গে এমনভাবে ব্যবহার করা দরকার যাতে তার চোখ খুলে যায়।'

ভাগ্যের কী পরিহাস! তিন বছর পরে দেখা গেল সেই স্পয়েল্‌ড চাইল্ডই সারা পৃথিবী দাবড়ে ইম্ফলে ফিরে এসে স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা প্রথম উড্ডীন করলেন। শুধু ইম্ফলে নয়, আন্দামান নিকোবর দ্বীপেও। বৃদ্ধ গান্ধীজির চোখই বরং তিনি খুলে দিয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে আরও লিপিবদ্ধ করে যাই, কংগ্রেস তাঁকে বহিষ্কার করায় তিনি প্রকৃত স্থিতপ্রজ্ঞের মতো বিহারের বাঁকিপুরে এক জনসভায় হিন্দিতে যা বলেছিলেন তার আক্ষরিক অনুবাদ (২৭.৮.১৯৩৮)—'কংগ্রেসের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও আনুগত্য অন্য কারও চেয়ে কম নয়। গত দুই দশক ধরে আমরা কংগ্রেসকে ক্রমাগত সংস্কৃত করে সংগ্রামের অস্ত্ররূপে প্রস্তুত করেছি। আমাদের মধ্যে যা কিছু সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ আমরা কংগ্রেসকে তাই অর্ঘ্য দিয়েছি। কংগ্রেসকে বর্তমান গৌরবান্বিত অবস্থায় উন্নীত করার জন্য আমরা সকলেই অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করেছি। আমি এত

নির্বোধ নই যে, আজ আমাদের সংগ্রামের সেই শাণিত হাতিয়ারটিকে নিবীর্য ও নিস্তেজ করে ফেলব। আজ আমি যে কংগ্রেসের নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছি তার একমাত্র হেতু এই যে, আমি কংগ্রেসকে শক্তিশালী করতে চাই—এমন শক্তিশালী করতে চাই যাতে স্বরাজ লাভের সংগ্রামে কংগ্রেস প্রকৃত শক্তিশালী অস্ত্ররূপে প্রযুক্ত হতে পারে। আপনারা বিশ্বাস করুন, এ ছাড়া আমার আর কোনও উদ্দেশ্য নেই। ..... আমি নিজের জন্য কোনো পদ চাই না। কংগ্রেস একবার সম্মুখ সংগ্রাম সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিলে আমি কংগ্রেসের দীন সেবকরূপে সেই সংগ্রামে সামিল হব।'

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার ছয়মাস পূর্বে (১০.৩.১৯৩৯) ত্রিপুরীতে ভারতীয় কংগ্রেসের তিপ্পান্নতম অধিবেশন বসল। সুভাষ সেদিন মারাত্মকভাবে অসুস্থ। তাঁকে স্ট্রেচারে করে সভামণ্ডপে নিয়ে আসা হল। মাথায় আইসব্যাগ ধরে বসে আছে নার্স। গান্ধীজি যথারীতি অনুপস্থিত — 'চারানি সভ্য' না হওয়ায়। সভাপতির ভাষণ ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। স্বকণ্ঠে তা সভাপতি পাঠ করে শোনাতে পারলেন না। সে সংক্ষিপ্ত ভাষণের বক্তব্য: 'কংগ্রেসের পক্ষে অনতিবিলম্বে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা দরকার — ছয় মাসের মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার না দিলে সর্বভারতীয় আইন অমান্যের আন্দোলন শুরু হবে।'

তাঁর এই প্রস্তাব ভীত-সন্ত্রস্ত কংগ্রেস-নেতার দল অনুমোদন করতে পারলেন না— জওহারলাল, গোবিন্দবল্লভ, প্যাটেল, আজাদ, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, রাজাগোপালাচারী প্রভৃতি, স্বাধীনতালাভের পর যাঁরা উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়ে বিলাসব্যসনের চূড়ান্ত নির্লজ্জতার প্রমাণ দিয়েছিলেন।

এর পরেই কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত হলেন সুভাষ। তিনি কংগ্রেসের ভিতরেই একটি স্বশাসিত 'ফরওয়ার্ড ব্লক' গঠন করলেন (৩.৫.১৯৩৯)। কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য হলেন হরিবিষ্ণু কামাথ (বোম্বাই)। ইনিও সুভাষের মতো আই. সি. এস. চাকরি ত্যাগ করে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। পাঞ্জাবের দায়িত্বে রইলেন সর্দার শার্দুল সিং কবিশের; দিল্লির নেতা লালা শঙ্করলাল, এছাড়া বিশ্বম্ভর দয়াল ত্রিপাঠী আর কে এফ নরিম্যান। বাংলার প্রাদেশিক সম্পাদকের দায়িত্ব পেলেন সত্যরঞ্জন বক্সী।

মাসতিনেক পরে শনিবারের এক অপরাহ্নে (১৯.৮.১৯৩৯) অসুস্থ শরীরে রবীন্দ্রনাথ মহাজাতি সদনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন। সুভাষকে দিলেন এক অদ্বিতীয় উপাধি: দেশগৌরব! তার এক মাসের মধ্যেই (২.৯.১৯৩৯) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। জার্মানীর দুর্ধর্ষ ট্যাঙ্কবাহিনী পোল্যান্ড আক্রমণ করে বসল। ব্রিটেন আর ফ্রান্স নিতান্ত অপ্রস্তুত অবস্থায় জড়িয়ে পড়ল বিশ্বযুদ্ধে। কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত সুভাষ

আবার গিয়ে দেখা করলেন গান্ধীজির সঙ্গে। ব্যক্তিগত অপমান ভুলে বললেন, এখনো যদি আমরা ব্রিটেনকে চরমপত্র দিতে না পারি তাহলে ইতিহাস কোনোদিন আমাদের ক্ষমা করবে না। গান্ধীজি বললেন, তিনি কোনও আলো দেখতে পাচ্ছেন না।

মার্চ মাসের মাঝামাঝি (১৯৪০) রামগড়ে মৌলানা আজাদের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের চুয়ান্নতম অধিবেশন বসে। তার ঠিক পাশেই প্যান্ডেল বানিয়ে সুভাষচন্দ্র ফরোয়ার্ড ব্লকের তরফে আপসবিরোধী (অ্যান্টি-কমপ্রোমাইজ) সম্মেলন করলেন। বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে অনতিবিলম্বে গণ-আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার কথা যুক্তিসহ তুলে ধরলেন।

তিন মাস পরে নাগপুরে আপসবিরোধীদের দ্বিতীয় সম্মেলন হল। সেখানে বক্তৃতায় সুভাষ বললেন, জার্মানী ইংল্যান্ডের টুঁটি টিপে ধরার আগেই ভারতকে ব্যাপক মুক্তি সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে। এমন সুযোগ শতাব্দীতে একবারই আসে। বললেন, With every blow she receives in Europe the imperialist might of Britain is bound to loosen its grip on India ..... It is for the Indian people to make an immediate demand for the transference of power to them through National Government. (ইউরোপে প্রতিটি মুষ্ট্যাঘাতের সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের মুঠি আলগা হয়ে যাবে। ভারতের জনগণ এখনই দাবি তুলুক, অবিলম্বে একটি জাতীয় সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হোক।)

মডারেট মোতিলালের উত্তরাধিকারী সুপুত্তুর এ প্রস্তাবে ঘটঘট করে মাথা নাড়লেন, "No! We are not going to embarrass the British war-efforts in India." কেন? জওহারলাল আরও বলেছিলেন,"Launching a civil-disobedience campaign at a time when Britain is engaged in a life and death struggle would be an act derogatory to India." অদ্ভুত যুক্তি! ব্রিটেনের সঙ্গে ভারতের কী সম্পর্ক? শাসক ও শোষিতের। তাই নয়? ঘটনাচক্রে জওহারলাল ইটন-হ্যারোতে লেখাপড়া শিখেছিলেন। তাঁর অনেক ইংরেজ সহপাঠী আছে। বন্ধু-বান্ধবী আছে। তাই ব্রিটেনের প্রতি তাঁর দুর্বলতা। গোটা ভারতের তাতে কী?

নেহরু নিজেই লিখেছেন, "I had imbibed most of the prejudices of Harrow and Cambridge and am perhaps more an Englishman than an Indian. I looked upon the world almost from an Englishman's standpoint." (হ্যারো আর কেমব্রিজের নানা রকম সংস্কার আমার মজ্জায় মজ্জায় ঢুকে গেছে হয়তো তাই আমি সারা দুনিয়াকে চিরদিন প্রায় একজন ইংরেজের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছি, ভারতীয়ের নয়। The Hindustan Times, 3.9.1935)

এমন জাতীয় নেতার পক্ষে ভারতের চেয়ে বেশি দামি ছিল ইংরেজের স্বার্থরক্ষা। ফলে চল্লিশের দশকে জওহারলালের দৃষ্টিভঙ্গির অর্থ হয়। কিন্তু গান্ধীজি কেন তাঁর হরিজন পত্রিকায় লিখলেন, "We do not seek our independence out of Britain's ruin." (ব্রিটেনের ধ্বংসমূল্যে আমরা স্বাধীনতা লাভ করতে চাই না।)
কংগ্রেস নেতৃবর্গের এই ইংরেজপ্রীতি আর সংগ্রামবিমুখতা দেখে হিউ টয় তাঁর গ্রন্থে (The Springing Tiger, P 92) লিখেছেন, "The British no longer took the Congress seriously, because it talked but did not act ...just as the British had not feared Gandhi... they no longer feared Nehru. The British, however, still feared Subhas Bose."
(তার পর থেকে ব্রিটিশ সরকার আর কংগ্রেসী নেতাদের হম্বিতম্বিকে কোনও পাত্তা দিত না। ... গান্ধীজির বিষয়ে তারা কোনোদিনই চিন্তিত ছিল না ... এতদিনে নেহরু সম্বন্ধে তাদের সব আশঙ্কা দূরীভূত হয়ে গেল। ব্রিটিশ সরকার এখন থেকে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে রইল শুধু একজনের বিষয়ে, সুভাষ বোস।)

দোসরা জুলাই উনিশশো চল্লিশ

কলকাতায় ডালহৌসি স্কোয়ার-এ রাইটার্স বিল্ডিংস-এর সামনে মিথ্যার বনিয়াদে বানানো জাতীয় অবমাননাকর 'হলওয়েল মনুমেন্ট' অপসারণের সিদ্ধান্ত নেওয়ায় ভারতরক্ষা আইনে আবার গ্রেপ্তার হলেন সুভাষচন্দ্র। তাঁকে প্রেসিডেন্সি জেলে বিনা বিচারে আটক করে রাখা হল।
তাতেও কংগ্রেস নেতৃত্ব মহলে কোনো সাড়া জাগল না। এমনটা তো হয়েই থাকে! আইন না মানলে জেলে যেতে হবে না? বাঃ?
অনেক পরে বর্মা রণাঙ্গনে নেতাজি এস. এ. আইয়ারকে বলেছিলেন, "At last, I decided myself inside the jail to get out of India." (Unto Him a Witness, S. A. Iyer). ভারতের বাইরে যেতে হলে প্রথম ধাপ জেলের বাইরে যাওয়া। ক্ষুরধারবুদ্ধি সুভাষ সেই প্রথম ধাপটি টপকাবার জন্য জেলের ভিতরে বসেই আমরণ অনশনের প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করলেন। তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত বাংলার গভর্নর এবং মন্ত্রিমণ্ডলীকে জানালেন (২৬.১১.১৯৪০) — সরকার পশুশক্তিবলে বিনা বিচারে তাঁকে জেলে আবদ্ধ রেখেছে। হয় তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হোক অথবা তিনি আত্মাহুতি দেবেন। লিখলেন, 'জড়জগতে কিছুই অবিনশ্বর নয়—ব্যতিক্রম শুধু স্বপ্ন এবং আদর্শ। শহিদের রক্তেই গির্জার বনিয়াদ। একজনের মৃত্যুর ভিতর দিয়ে শত সহস্র জীবন আগুনে আহুতি দিতে এগিয়ে আসে।' ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহারলালও বহুবার জীবনে জেলে আটক থেকেছেন। কিন্তু এমন পত্র রচনা করতে পারেনি তাঁর লেখনি—

জীবনে একবারও। তার কারণ এই যে, তিনি আজন্ম মডারেট। বিদ্রোহী বা বিপ্লবী নন। তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল, ইংরেজের বদান্যতায় ভারত একদিন স্বাধীন হবেই, এবং সেই মহালগ্নে তাঁকে প্রস্তুত থাকতে হবে সে দান সকৃতজ্ঞচিত্তে দু-হাত পেতে গ্রহণ করতে। এটাই তাঁর জীবনের ব্রত।

জওহারলালের আদর্শ ছিলেন 'নন্দলাল': 'অভাগা দেশের কী হবে তাহলে আমি যদি মারা যাই?'

মহাত্মাজির আদর্শ ছিলেন যিসাস: 'কেউ তোমার এগালে চড় মারলে তুমি অপর গালটি তার দিকে বাড়িয়ে দেবে।'

সুভাষচন্দ্রের আদর্শ ছিলেন বিবেকানন্দ: 'ভুলিও না, তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত।'

জওহার আর গান্ধী ইংরেজকে ছয় মাসের নোটিস দিতে সাহস পেলেন না; আর প্রেসিডেন্সি জেলে বসে একা সুভাষ সেই ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে মাত্র বাহাত্তর ঘণ্টার নোটিস দিলেন — ছাব্বিশ থেকে উনত্রিশে নভেম্বর। সেই দুষ্প্রাপ্য ঐতিহাসিক দলিল থেকে এই অবকাশে আপনাদের কিছু উদ্ধৃতি শোনাই : 'Government are determined to hold me in prison by brutal force. I say in reply—release me or I shall refuse to live—and it is for me to decide whether I choose to live or to die .... It is through suffering and sacrifice alone that a cause can flourish and prosper and in every age and clime the eternal law prevails—the blood of the martyr is the seed of the church. In this mortal world everything perishes and will perish, but ideas and dreams do not. One individual may die for an idea, but that idea will, after his death, incarnate itself in a thousand lives. That is how the wheels of evolution move on .... To my countrymen I say, 'Forget not, that the greatest curse of a man is to remain a slave. Forget not, that the grossest crime is to compromise with injustice and wrong. Remember the eternal law—you must give life if you want to get it .....' To the government of the day I say–'Cry halt to your mad drive along the path of communalism and injustice. Do not use a boomerang which will soon recoil on you ... I shall commence my fast on the 29th November 1940.'

এই প্রসঙ্গে আমার পূর্ব প্রকাশিত গ্রন্থ ('আমি নেতাজীকে দেখেছি') থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি দিতে ইচ্ছে করছে। আই. এন. এ.-র যুদ্ধমন্ত্রী এস. এ. আইয়ারের স্মৃতিচারণ থেকে :

—'কথার পিঠে মজাদার কথা বলার সুযোগ পেলে উনি (নেতাজি) তা কিছুতেই ছাড়তেন না। ইংরেজিতে যাকে বলে 'লেগ-পুলিং', সেটায় তাঁর ছিল সুনিপুণ দক্ষতা। মজা হচ্ছে ঠ্যাংটা কার সে সম্বন্ধে তাঁর কোনো বাছবিচার ছিল না। হাসির খোরাক থাকলে এমনকি নিজের ঠ্যাং ধরে টানতেও তাঁর আপত্তি নেই।

একদিনের কথা মনে পড়ছে। সেটাও খাবার টেবিলে — আফটার ডিনার গজালি। আমরা চার-পাঁচজন ছিলাম। গল্প জমে উঠেছে। কথায় কথায় 'বোকামি'র প্রসঙ্গ উঠল। কে কবে কীভাবে বোকা বনেছে। নেতাজি বললেন, 'নিজেকে আমি মোটামুটি বুদ্ধিমান বলেই মনে করি। অনেকে আমাকে অনেকভাবে গালমন্দ করেছে—সামনে অথবা আড়ালে; কিন্তু মুখের ওপর 'বোকা-গাধা' কেউ কখনো বলেনি। জীবনে একবার আমাকে 'গাধা' বলেছিল একজন, বুঝলে? বেশ কায়দা করে ঘুরিয়ে বলেছিল। কথার প্যাঁচে।'

কৌতূহল হয়েছিল সকলেরই; কিন্তু ব্যাপারটা এমন স্পর্শকাতর যে, কেউ কিছু প্রশ্ন করতে পারে না।

আমাদের সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে উনি আবার বলে চলেন, 'চল্লিশ সালের নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ। ব্রিটিশ জেলে বিনা বিচারে আটক পড়ে আছি। কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে। ইয়োরোপে ঘোর যুদ্ধ চলছে। অস্ট্রিয়া আর চেকস্লোভাকিয়া মুছে গেছে ইয়োরোপের ম্যাপ থেকে। পোল্যান্ডের আধখানা কেড়ে নিল হিটলার; বাকি-আধখানা দখল করল রাশিয়া। বুড়ো ব্রিটিশ সিংহ তখনো খাঁচার ভিতর গর্জাচ্ছে। বাইরে বেরিয়ে আসার সাহস সঞ্চয় করতে পারছে না। আমি বেশ বুঝতে পারছি— এই হচ্ছে ভারতবর্ষের শেষ সুযোগ। আমার সহকর্মীরা এসময় নিশ্চুপ অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করতে রাজি নন! আমি আবার এ সুযোগ কিছুতেই ছাড়তে রাজি নই। যেমন করে হোক আমাকে ভারতের বাইরে আসতে হবে। কিন্তু তার আগে বার হতে হবে জেল থেকে। কী করা যায়? কোনো পথ দেখতে না পেয়ে আমি আমরণ অনশনের সংকল্প ঘোষণা করলাম। আমি দেখতে চেয়েছিলাম, যুদ্ধের সেই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে দ্বিতীয়বার যতীন দাসের মৃত্যুর মোকাবিলা করার মতো হিম্মৎ আছে কি না ব্রিটিশ সিংহের।

বাংলার গভর্নরকে আমি যে চিঠি লিখেছিলাম জেল কর্তৃপক্ষ তা সেন্সর করতে খুলে পড়ল। সে সময় জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন একজন পাক্কা ইংরেজ অফিসার। চিঠিখানা হাতে নিয়ে তিনি গটগট করে চলে এলেন আমার সেল-এ। চিঠিখানা বাড়িয়ে দিলেন আমার নাকের ডগায়। বললেন, 'বেশি সময় আপনার নেব না। একটি ছোট্ট প্রশ্ন করব, মিস্টার বোস। আপনি কি জানেন যে, একটা মরা সিংহের চেয়ে একটা জ্যান্ত গাধার বাজারদর বেশি? এ চিঠিখানা পাঠাবার আগে কথাটা না হয় নিরিবিলিতে একটু ভেবে দেখবেন। নিন ধরুন .....'

বলেই হো-হো করে হেসে উঠলেন নেতাজি। আমরা কিন্তু সে হাসিতে যোগ দিতে পারিনি। আমি বলি, আপনি কোনও জবাব দেননি?

'উনি বললেন, দিয়েছিলাম। জবাবে আমি বলেছিলাম, আমিও বেশি কথা বলব না মিস্টার সো অ্যান্ড সো। বরং একটা ছোট্ট প্রতিপ্রশ্ন করব: আপনি কি জানেন যে, একটা জ্যান্ত গাধা এই জেল-কম্পাউন্ডে ঢুকে পড়লে—তা সে কয়েদীর ছদ্মবেশেই হোক বা জেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট রূপেই হোক—ব্রিটিশ সরকার তাকে সহজেই খেদিয়ে দিতে পারবে; কিন্তু অত সহজে একটা সিংহের মৃতদেহ কি চুপি চুপি জেলের বাইরে পাচার করা যাবে? আপনিও বরং চিঠিখানা পাঠাবার আগে নিরিবিলিতে ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখবেন। নিন ধরুন ...

'লাল টুকটুকে মুখটা লম্বা হয়ে গিয়েছিল ব্রিটিশ জেলারের।

এতক্ষণ আমরা সবাই অট্টহাস্য করে উঠি।'

যে কথা বলছিলাম:

যুদ্ধের সেই ডামাডোলের বাজারে যতীন দাসের দ্বিতীয়বার মৃত্যুর মোকাবিলা করার হিম্মৎ হল না ব্রিটিশ সরকারের। সিংহটা যদি মরে তবে এলগিন রোডের বাড়িতে গিয়ে মরুক — জেলের ভেতর নয়। এই সিদ্ধান্ত নিল ব্রিটিশ সরকার।

স্বাস্থ্যের কারণে সুভাষকে মুক্তি দেওয়া হল, কিন্তু স্থির হল সিংহ নিজের বাড়িতে খাঁচা-বন্দি হয়ে থাকবে। সুস্থ হয়ে উঠলে আবার তাঁকে জেলে ফিরিয়ে আনা হবে। সুভাষ এসে উঠলেন এলগিন রোডের বাড়িতে। পাহারায় থাকল পাক্কা তিনকুড়ি দুজন—আজ্ঞে হ্যাঁ, বাষট্টিজন গোয়েন্দা পুলিস। শিফট ডিউটিতে তারা চব্বিশ ঘণ্টা পাহারায় থাকবে। তাদের নিয়ন্ত্রণ করবেন একজন ডেপুটি কমিশনার অব পুলিস।

এলগিন রোডের বাড়িতে উনি এসে উঠলেন ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি আর জানুয়ারির মাঝামাঝি গুজব শোনা গেল, সুভাষচন্দ্র নাকি আত্মসন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন। 'আত্মসন্ন্যাস'। সে আবার কী? শোনা গেল : স্বপ্নের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ অথবা বিবেকানন্দ কে যেন এসে ওঁকে 'সন্ন্যাস' দান করেছেন। উনি সর্বসময় নিজের একান্ত কক্ষে রুদ্ধদ্বারে ধ্যানমগ্ন থাকেন। বাড়ির লোকজনের সঙ্গে আর দেখাসাক্ষাৎ করছেন না। একেবারে তুরীয় অবস্থায় আছেন। প্রতিদিন একটা থালায় কিছু ফলমূল ও পানীয় সংলগ্ন কক্ষে রেখে আসা হয়। দুটি ঘরের মধ্যে সংযোগকারী দরজা আছে। উনি কখনো তা আহার করেন, কখনো সম্পূর্ণ উপবাসে ধ্যানমগ্ন বসে থাকেন।

কেটে গেল কয়েক সপ্তাহ। এক গাল দাড়ি গজাতে যতদিন সময় লাগে আর কি! তারপর একচল্লিশ সালের সতেরোই জানুয়ারি হল মহানিষ্ক্রমণ!

এই মহানিষ্ক্রমণ শব্দটিতে কোনো কোনো বিদগ্ধজন আপত্তি করেছেন। যেমন শ্রীকানাইলাল বসু তাঁর **'নেতাজী: নতুন করে দেখা'** গ্রন্থে বলছেন (পৃঃ ৫০)

"অন্তর্ধান বা মহানিষ্ক্রমণ' শব্দ দুটির মধ্যে দুঃসাহসিকতার বা ফিরে আসার কোনও ইঙ্গিত নেই। আমরা বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগকে 'মহানিষ্ক্রমণ' বলে থাকি। কারণ তিনি আর কোনও দিনই গৃহে ফেরেননি।"

কানাইলালবাবু এজন্য এটিকে 'অভিযাত্রা' বলতে চেয়েছেন।

আমরা কিন্তু শ্রদ্ধেয় কানাইলালবাবুর সঙ্গে একমত হতে পারছি না। প্রথম কথা : বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগকে বৌদ্ধশাস্ত্রে 'মহানিষ্ক্রমণ' বলা হয় না। তাঁর সেই একমাত্র ব্যতিক্রম ক্ষেত্রে সেটা 'মহাভিনিষ্ক্রমণ'। যেমন, আর সব বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর অন্তিমে 'মহানির্বাণ' হয়, একমাত্র লোকোত্তম বুদ্ধদেবের ক্ষেত্রে সেটা 'মহাপরিনির্বাণ'। দ্বিতীয় কথা : 'বুদ্ধদেব আর কোনওদিন সে গৃহে ফিরে আসেননি'—এটাও ভ্রান্ত ধারণা। আত্মসন্ন্যাস গ্রহণকালে রাজপুত্র গৌতম রাজসারথি চন্নকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন: বুদ্ধত্বলাভের পর তিনি কপিলাবাস্তুতে প্রত্যাগমন করবেন। তাই করেছিলেন তিনি। ললিতবিস্তারে তার বর্ণনা আছে, অজন্তার সপ্তদশ গুহাবিহারে তার চিত্রও আছে। অপরপক্ষে সুভাষচন্দ্রই আজ পর্যন্ত এলগিন রোডের সেই মহাতীর্থে প্রত্যাবর্তন করেননি।

কানাইবাবু একে 'অভিযাত্রা' বলতে চেয়েছেন। 'যাত্রা' মানে: গমন, প্রস্থান, যাওয়া— তীর্থযাত্রা, সমুদ্রযাত্রা, বিদেশযাত্রা। প্রত্যেকটিই 'পুনরাগমনায়চ' অনুক্তমন্ত্রের ইঙ্গিতবাহী। অভি প্রত্যয়ে ব্যাপকতা বা মহত্ত্ব যুক্ত হতে পারে, কিন্তু 'নিষ্ক্রমণ' শব্দের মধ্যে 'বাধা অতিক্রম করে সঙ্গোপনে বাইরে চলে আসা'র যে ব্যঞ্জনাটি আছে, তা অভিযাত্রায় হারিয়ে যায়। কংসের কারাগার থেকে জন্মাষ্টমী রাত্রে শ্রীকৃষ্ণ কি গোকুল অভিমুখে 'যাত্রা' করেছিলেন? অথবা 'অভিযাত্রা'? না! সেও এক 'মহানিষ্ক্রমণ'।

তা সে যাই হোক, কীভাবে এই মহানিষ্ক্রমণ সংঘটিত হয়েছিল তা নিয়ে এখনো সন্দেহের অবকাশ আছে। ওঁর পরিবারস্থ কিছু ব্যক্তি নিশ্চয় তা স্বচক্ষে দেখছেন অথবা স্বজ্ঞানে জানেন—কেউ কেউ এ নিয়ে বইও লিখেছেন; কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধাপগুলি তাঁরা অনুক্ত রেখেছেন। বলা হয়েছে গভীর রাত্রে চাদর মুড়ি দিয়ে তিনি ছদ্মবেশে গেট-এর বাইরে আসেন। আমাদের মনে স্বতই প্রশ্ন জাগে: সে কী! গেট-এ কি পাহারাদার ছিল না? এলগিন রোডে? তারা কেন টের পেল না? আপনারা যদি কথাসাহিত্যের ছাড়পত্র অনুমোদন করেন তাহলে আমিই অ্যাইসা গপ্পো ফাঁদতে পারি যে, আপনাদের তাক লেগে যাবে — আসলে কী হয়েছিল জানেন? শুনুন, বলি: সুভাষচন্দ্র যে রুদ্ধদ্বারে তপস্যা করছেন একথা সবাই জানত। সেদিন সন্ধ্যায় সন্ন্যাসী ঠাকুর পূজান্তে সবাইকে 'লাড্ডু' প্রসাদ পাঠিয়েছিলেন। যে বাষট্টিজন পুলিস প্রহরায় ছিল তারা হেঁদু অথবা পেটুক। নির্দিষ্ট ডোজের 'সিডেটিভ' (ঘুমপাড়ানিয়া) মিশ্রিত

লাড্ডুর প্রভাবে এ ওর গায়ে গা ঠেকিয়ে ঘুমিয়ে কাদা! — কী খাশা গপ্পো বলুন তো?

কিন্তু মুশকিল এই যে, এটা কাঁটা-সিরিজের গপ্পো নয়, তাই লেখকের কোনো ছাড়পত্র নেই। কাঁটাটা রহস্যাবৃতই থাক তাহলে।

দ্বিতীয় কথা: বলা হল, উনি রওনা দিলেন একটি জার্মানী মেক গাড়িতে— 'ওয়ান্ডারার' মডেল। যার নম্বর বি. এল. এ. ৭১৬৮। যেটি এখনো দেখতে পাবেন নেতাজি ভবনে। কিন্তু তা কেমন করে হয়? সেই গাড়ি চেপে এলগিন রোড থেকে রওনা হয়ে গ্রান্ড-ট্যাঙ্ক রোড ধরে গোমো স্টেশন পর্যন্ত তিনি কেমন করে চলে যান? মিলিটারি কনভয়ে আকীর্ণ জি. টি. রোডে সেই মধ্যরাত্রে কোনও চেকিং হল না? তাঁর এক নিকট আত্মীয় জানিয়েছেন, তিনি সুভাষচন্দ্রকে ড্রাইভ করে গোমো পর্যন্ত পৌঁছে দেন। ট্রেনে সুভাষচন্দ্র সোজা চলে যান পেশোয়ার। তখন তাঁর পরিধানে ছিল মুসলমান ভদ্রলোকের পোশাক। ঢিলেঢালা পায়জামা, পাঞ্জাবি, মাথায় ফেজ। ছদ্মনাম মহম্মদ জিয়াউদ্দীন। ইম্পিরিয়াল ইন্সিওরেন্স কোম্পানির ইন্সপেক্টর। আইডেন্টিটি কার্ড তাঁর জেব-এ। ফটোসমেত।

কীর্তি কিষাণ পার্টির নির্দেশে (খোদায় মালুম প্রেসিডেন্সি জেল থেকে যিনি মাত্র তিন-চার সপ্তাহ আগে পুলিস প্রহরায় এলগিন রোডে এসেছেন, তিনি কীভাবে 'কীর্তি কিষাণ পার্টির' সঙ্গে যোগাযোগ করলেন, কোন ট্রেনে, কবে, কোথায় যাবেন তা জানাতে সক্ষম হলেন। এ ম্যাজিক হয়তো পি.সি. সরকার দেখাতে পারতেন, সুভাষচন্দ্র কেমন করে দেখালেন?) ভগতরাম তলোয়ার স্টেশনে হাজির ছিলেন। (একটা কাকতালীয় ঘটনা কি নজরে পড়ে আপনাদের? 'সব্যসাচী'কে রেঙ্গুনের রাস্তায় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে দেখে একজন তাঁকে প্রশ্ন করেছিল 'বাবুজি, ম্যায়নে আপকো পহিলে জরুর কাঁহা দেখা'। ভগতরাম তলোয়ারের মতো সে লোকটার উপাধিও ছিল তলোয়ারকর।)

যেহেতু সীমান্ত দেশের ভাষা জানা নেই তাই জিয়াউদ্দীন এখন আর বীমা কোম্পানীর এজেন্ট নন, মূক-বধির এক তীর্থযাত্রী। চলেছেন আফগানিস্তানের কোনো পীরের দরগায় সিরনি চড়াতে। কীভাবে বিনা পাসপোর্টে সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অতি সতর্ক প্রহরা এড়িয়ে সীমান্ত অতিক্রম করলেন তাও রহস্যাবৃত। উপস্থিত হলেন সিনওয়ারি গ্রামে। আফগানিস্তানের এক প্রত্যন্ত গ্রাম। বানানো গল্পকথা বলে মনে হয়, কিন্তু তথ্য যা সংগ্রহ করতে পেরেছি তাতে তিনি সীমান্ত অতিক্রম করেন সাতাশ তারিখে, আর আঠাশ তারিখ ভোরবেলা আমরা সংবাদপত্রে জানতে পেরেছিলাম যে, সন্ন্যাসী ঠাকুর ওই এলগিন রোডের বাড়ি থেকে স্রেফ কর্পূর।

ব্রিটিশ সরকার চতুর্দিকে গ্রেপ্তারি পরওয়ানা পাঠাচ্ছে—প্রতিটি সীমান্ত ঘাঁটি, প্রতিটি বন্দরে জোর তল্লাসি শুরু হয়ে গেছে।

ততক্ষণে সীমান্ত অতিক্রম করে মহম্মদ জিয়াউদ্দিন চলেছেন খাইবার গিরিবর্ত্ম ধরে। যে ইতিহাস-চিহ্নিত পথরেখা ধরে কাশ্যপমাতঙ্গ গিয়েছিলেন মহাচীন খণ্ডে, যে পথরেখা ধরে ভারতে এসেছিলেন হিউ-এ-নৎসাঙ। ওঁরা চলেছেন আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের দিকে। জানুয়ারির শীত। চারিদিক বরফে ঢাকা। উপযুক্ত শীতবস্ত্র নেই গায়ে। কখনও চলেছেন লরিতে মালপত্রের ভেতরে আত্মগোপন করে, কখনও খচ্চরের পিঠে চড়ে, কখনো বা পদব্রজে। জিয়াউদ্দিনের সঙ্গী এখন নতুন ছদ্মনাম নিয়েছেন—রহমৎ খান। আমার বিশ্বাস নামকরণটা মৌলানা জিয়াউদ্দীনের মস্তিষ্কপ্রসূত। কারণ ভগতরাম তলোয়ার তো জানেন না রবিঠাকুরের 'কাবুলিওয়ালার' কী ছিল গুরুদেবপ্রদত্ত নাম।

এখানে একজন পাঠান পুলিসের সন্দেহ হয়—ঐ মূক-বধির জিয়াউদ্দীনকে দেখে। এক মুঠো সিক্কা টাকায় তাকে খুশি করে দিয়ে রহমৎ তাকে বিদায় করেন। বেচারি জানতেও পারেনি যে, ওই মৌলানা জিয়াউদ্দীনকে ব্রিটিশ গোয়েন্দার হাতে তুলে দিতে পারলে তার সাতপুরুষের হিল্লে হয়ে যেত। একমুঠো সিক্কা টাকা? ফুঃ!

কাবুলে ওঁরা আশ্রয় পেলেন উত্তমচাঁদ বা উধমচাঁদের ভদ্রাসনে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কাবুল থেকে সুভাষচন্দ্র সর্বপ্রথমে রাশিয়ার সঙ্গেই ভারতের 'জনযুদ্ধ' পরিচালনার পরিকল্পনা করেছিলেন। একই সঙ্গে জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রকের মাধ্যমে জার্মানী এবং ইতালীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। কাবুলে ইতালীয় মন্ত্রী আর বার্তো কোয়ারোনির সঙ্গে দেখা করলেন।

ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যেই তাঁর নামে ছদ্মপাসপোর্ট তৈরি হয়ে গেল। সুভাষচন্দ্র বোসের নাম হল অরল্যান্ডো মাসোত্তা।

মার্চ মাসে তিনি মস্কোয় পৌঁছন; কিন্তু সাম্যবাদীর দেশ তাঁকে সাহায্য করবে বলে মনে হল না। পরিস্থিতি সুবিধার নয় বিবেচনা করে তিনি পয়লা এপ্রিল আকাশপথে মস্কো থেকে বার্লিনে চলে আসেন। ওই সপ্তাহেই ভিয়েনার হোটেল ইম্পিরিয়ালে জার্মানীর বিদেশমন্ত্রী ফন রিবেনট্রপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁর মাধ্যমে নাৎসী সরকারের কাছে 'প্ল্যান ফর কোঅপারেশন বিটুইন দি অ্যাক্সিস পাওয়ার্স অ্যান্ড ইন্ডিয়া' পরিকল্পনা পেশ করেন। ওই সময় ভারতীয় যুদ্ধবন্দিদের নিয়ে তিনি একটি বাহিনী গঠন করলেন। সুভাষ তার নামকরণ করতে চেয়েছিলেন আই.এন.এ. অর্থাৎ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি। নাৎসী জার্মানী রাজি হয়নি। তারা এর নামকরণ করেন—ইন্ডিয়ান লিজন।

ওইসময় যেসব ভারতীয় ছাত্র জার্মানীতে পড়াশুনো করছিল—হঠাৎ যুদ্ধ বেধে যাওয়ায় তারা হয়ে পড়েছিল শত্রুপক্ষের দেশের লোক। রিবেনট্রপের মাধ্যমে সুভাষচন্দ্র তাদের একত্র করে একটি 'ফ্রি ইন্ডিয়া সেন্টার' খুললেন। তাদের পারস্পরিক সম্ভাষণের প্রয়োজনেই প্রথম সৃষ্ট হল একটি সৌজন্য সম্ভাষণ—যে শব্দটি পরবর্তীকালে হয়েছিল হাজার হাজার আজাদ হিন্দ সৈনিকের বীজমন্ত্র : জয়হিন্দ (২.১১.১৯৪১)।
২৮.২.১৯৪২ তারিখে জার্মানী থেকে শোনা গেল ইথার তরঙ্গে জলদগম্ভীর এক সিংহনাদ—আমি সুভাষ বলছি।

দুই

আটত্রিশ কোটি সন্তানের জননী। তাঁর বড় আদরের সেই ছেলেটি। একমাত্র সে-ই বুঝতে পেরেছিল শৃঙ্খলিতা মায়ের দুঃখ। তখন আর যারা মায়ের সংসারের ভাগিদার — খায়-দায়, ডুগডুগি বাজায় আর হম্বিতম্বি করে বেড়ায়, তারা মায়ের দুঃখ বোঝে না। মায়ের বন্ধনদশা মোচন করার প্রয়াসে তারা জেলে গিয়ে এ-ক্লাস রাজনৈতিক আসামী হতে রাজি, রুখে দাঁড়াবার হিম্মৎ নেই। আর সেই মায়ের বড় আদরের কোলপোঁছা ছেলেটা পক্ষিরাজের পিঠে সওয়ার হয়ে মেঘমুলুকে নিরুদ্দেশ যাত্রায় রওনা হয়েছিল! সে যেন কত যুগ আগেকার কথা! হঠাৎ কোন অজানা ভিনদেশের গুহাকন্দর থেকে আচমকা ভেসে এল সেই হারানো ছেলের জলদগম্ভীর সিংহনাদ: মা! আমি মরিনি! বেঁচে আছি! ভয় নেই। হাতিয়ারবন্দ হয়ে শিগ্গিরই ফিরে আসব! কারাগার থেকে তোমাকে মুক্ত করব!
চোখের জলে বুক ভেসে গেল ভারত মায়ের।
আপনারা — যাঁরা সে যুগকে প্রত্যক্ষ করেননি — তাঁরা যা কল্পনা করছেন বাস্তবে তা কিন্তু আদৌ ঘটেনি! সুভাষের কণ্ঠস্বর বেতারে শুনতে পেয়ে ছেলেমেয়ের দল নাচতে নাচতে রাস্তায় নেমে আসেনি। পটকা ফাটেনি, আতসবাজি পোড়েনি, ঘরে ঘরে দীপাবলী হয়নি। খুব কম লোকই তা স্বকর্ণে শুনেছে। যারা শুনেছে তারা নিকট বন্ধুর কাছে গোপনে ফিসফিস করেছে। কে জানে কে টিকটিকি! ব্রিটিশের দালাল! মাসছয়েক আগে রাশিয়া জড়িয়ে পড়েছিল বিশ্বযুদ্ধে। স্ট্যালিন আর চার্চিলে গলাগলি ভাব। তাই আমাদের বন্ধুদলের অনেকেই তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে 'জনযুদ্ধ'কে জড়িয়ে নিয়েছে। বেতারে শোনা যাচ্ছে:

> 'আমার পরাধীন, নিপীড়িত, নির্যাতিত ভারতবাসী ভাইবোনেরা, তোমরা আমার কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ, আমি তোমাদের সেই সুভাষ। সুভাষ

বোস। বেঁচে আছি! ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের ব্রত উদ্‌যাপন করতে এখানে — এই সুদূর বহির্ভারতের এক অঞ্চল থেকে তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি! আমরা এখানে একটি মুক্তিবাহিনী গঠন করেছি। অতি শীঘ্রই সেই মুক্তিবাহিনী নিয়ে ভারতে ফিরে আসব। তোমরা প্রস্তুত থেকো। জয়হিন্দ!'

'জয়হিন্দ্'! তার মানে?

আমি তখন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে আই. এস সি. পড়ি। থাকি বৌবাজার অঞ্চলে। নিজেদের বাড়ির তেতলায়। চারতলার চিলেকোঠার ছাদে মধ্যরাত্রে—বাড়ির সবাই গভীর নিদ্রামগ্ন হলে — আমরা দু-বন্ধু শর্টওয়েভ রেডিওর নব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেই কণ্ঠস্বর ধরবার চেষ্টা করতাম। আমি আর আমার বন্ধু, ভানু — সুকুমার মুখার্জি। তখনো 'নেতাজি' শব্দটা শুনিনি; জানি না। তবে তাঁর কণ্ঠস্বর শুনেছি। বাঙলায় নয়, হিন্দী। একদিন ইংরেজিতেও। অর্ধেক কথা বুঝতেই পারতাম না। তবে অচেনা অজানা 'জয়হিন্দ' শব্দটা শুনে বুঝতে পেরেছিলাম তার অর্থ। শুনে শিহরিত হয়েছিলাম। রাত একটায় ছাদের পাঁচিল টপকে ভানু যখন ওদের ফ্ল্যাটে চলে যাচ্ছে, তখন বলে, 'চলি রে নারাণ। গুড নাইট!

আমি ওর হাত চেপে ধরে বলেছিলাম—গাধা কোথাকার! গুড নাইট কি রে? শুনলি না এইমাত্র? বল: 'জয়হিন্দ'।

নানারকম ডিস্টার্বেন্স হত। জানি না, সেটা ব্রিটিশ কাউন্টার-এসপাওনেজের অবদান কি না। একটা কথা জানতাম যে, রাত জেগে এভাবে রেডিওতে নেতাজির কণ্ঠস্বর শুনবার চেষ্টাটা বে-আইনি, জানাজানি হলে মাজায় দড়ি পড়বে। বন্ধুরাই ধরিয়ে দেবে। জনযুদ্ধের জিগির তোলা দেশপ্রেমিক বন্ধুরা।

তাঁর ভাষণের যেটুকু এখানে উদ্ধৃত করেছি তা আমি স্বকর্ণে শুনিনি। পরবর্তী সাংবাদিকতা থেকে সংগ্রহ করেছি মাত্র। এই ভাষণ পড়তে পড়তে স্বতই মনে পড়ে যায় আর এক সন্ন্যাসীর আর্তনাদ— সুভাষচন্দ্রের আত্মিক গুরু স্বামী বিবেকানন্দের খেদোক্তি: 'আমি সারা ভারত ভ্রমণ করিয়াছি। আমার বুক ভাঙিয়া গিয়াছে। জনগণের কী ভীষণ দারিদ্র্য! কী শোচনীয় দুর্দশা দুই চক্ষে দেখিলাম। আমার কান্না থামিতেছে না। এখন বুঝিয়াছি, ধর্মপ্রচার করিবার সময় এ নহে।'

সুভাষচন্দ্র এই রিলে রেসের এক প্রতিযোগী। স্বামীজির হাত থেকে স্বদেশপ্রেমের আলোকবর্তিকা তুলে নিয়ে ইথার তরঙ্গে তিনি বললেন—

'আমি কেন আমার জন্মভূমি পরিত্যাগ করিলাম, সেই কথা আজ খোলাখুলি আপনাদের কাছে বলি — অভিজ্ঞতার আলোকে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, ভারতবর্ষের ভিতরে থাকিয়া আমরা যত প্রচেষ্টাই করি না কেন, ব্রিটিশশক্তিকে ভারত হইতে বিতাড়িত করিবার পক্ষে তাহা যথেষ্ট

হইবে না।... সুতরাং সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ভারতে যে সংগ্রাম চলিতেছে বাহির হইতে তাহার শক্তিবৃদ্ধি করাই আমার দেশত্যাগের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল।'

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কিন্তু বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মোড় অতিক্রম করেছে। যুদ্ধ ঘোষণা না করে জাপান অতর্কিতে পার্ল হারবারে অনেকগুলি বন্দরে নোঙর করা যুদ্ধ জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছে (৭.১২.১৯৪১)। এটা জাপানের তরফে এক অমার্জনীয় অপরাধ। মহাকাল তাকে মার্জনা করেনি। এই কাপুরুষোচিত আক্রমণের প্রায়শ্চিত্ত তাকে করতে হয়েছিল অনেক পরে — হিরোশিমায় আর নাগাসাকিতে। পরদিন (৮.১২.১৯৪১) আমেরিকা জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

উনিশশো বিয়াল্লিশ সালের শুরু থেকেই জার্মানীর আজাদ-হিন্দ বেতার স্টেশনে ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে ব্যাপক প্রচার শুরু হয়। বলা বাহুল্য, নেতাজির উদ্‌যোগে। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি জাপানী আক্রমণে সিঙ্গাপুরের পতন হল (১৫.২.১৯৪২)। তার পক্ষকালের মধ্যেই সুভাষচন্দ্র জার্মান বেতারে আত্মঘোষণা করেন। একই সময়ে জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজো ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থন করেন।

কিছুদিনের মধ্যেই দেখছি (৮.৩.১৯৪২) মৌলানা আবুল কালাম আজাদ জওহারলালকে একটি চিঠিতে লিখছেন, 'দিন চারেক আগে বার্লিন বেতারে আমি সুভাষবাবুর একটি ভাষণ শুনেছি। এটি কিছুতেই রেকর্ড করা ভাষণ নয়। কারণ এতে এত সাম্প্রতিক ঘটনার উল্লেখ আছে যাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এটি 'লাইভ ব্রডকাস্ট'। .... আমার অনুমান সুভাষবাবু জাপানে নেই। পৃথিবীর অন্য কোনও প্রান্তে রয়েছেন। সম্ভবত জার্মানীতে।'

এ পত্রের জবাবে আতঙ্কগ্রস্ত জওহারলাল আজাদকে কী লিখেছিলেন তার হদিস পাইনি। হ্যাঁ, আতঙ্কের কথা বইকি! প্রথম কথা, দুশমনটা জিন্দা আছে; দ্বিতীয়ত, যুদ্ধান্তে ব্রিটেনকে শাসনক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবেই। কিন্তু সেটা হাত পেতে নেবে কে? গান্ধীজি বৃদ্ধ, তাই এ নিয়ে এতদিন কোনো চিন্তা ছিল না। এখন হল।

ফ্রি-ইন্ডিয়া সেন্টার জার্মানীতে স্থাপিত হয়েছিল উনিশশো একচল্লিশ সালের দোসরা নভেম্বর। লিজিয়নের সৈন্যরা ভারতীয় জাতীয় পতাকার সামনে দাঁড়িয়ে শপথ গ্রহণ করেছেন। কংগ্রেসের সেই ত্রিবর্ণরঞ্জিত ঝাণ্ডাই; তবে মাঝখানে চরকার পরিবর্তে একটি উল্লম্ফনরত রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। অর্থাৎ কংগ্রেস এবং তা থেকে দক্ষিণপন্থীদের দ্বারা বিতাড়িত ফরোয়ার্ড-ব্লকের মিলিত পতাকা। কংগ্রেসের পতাকা গ্রহণ করার অধিকার যে কেড়ে নেওয়া হয়েছে ছয় বছরের জন্য সেই আদরে নষ্ট 'স্পয়েল্ড চাইল্ড'-এর কাছ থেকে।

জাতীয় সঙ্গীতটা কেড়ে নেবার অধিকার দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসের ছিল না। সেটায় শুধু কংগ্রেসের নয়, ভারতীয় মাত্রেরই অধিকার। তাই জার্মানীতে ওই লিজিয়নের জাতীয় সঙ্গীত ছিল গুরুদেবের: জনগণমন অধিনায়ক .....

উনিশশো বিয়াল্লিশ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে আজাদ-হিন্দ বেতারে সম্প্রচারিত হতে শুরু করল সুভাষচন্দ্রের ... না, ততদিনে তিনি নেতাজি, —কণ্ঠস্বর :

> 'স্বাধীনতা আমরা আমাদের বাহুবলেই অর্জন করব। স্বাধীনতা কোনো মেঠাই নয়। তা কেউ কারও হাতে তুলে দিয়ে সৌজন্য দেখায় না। বীর্যশুল্কে রক্তস্নানে তা ক্রয় করতে হয়।'

তখনই তিনি বুঝেছিলেন 'ভিক্ষায়াং' প্রাপ্ত স্বাধীনতা হয়ে যায় মেকি আজাদি! ভারতের মুষ্টিমেয় মানুষ তা স্বকর্ণে শুনেছে। তারা আন্তর উদ্বেগে উন্মাদ হয়ে গেছে। তার কোনও বাহ্য প্রকাশ করার উপায় ছিল না। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলি—কী কংগ্রেস, কী কম্যুনিস্টপার্টি — সুভাষের এই বহির্ভারত থেকে ভারত-উদ্ধারের বিরুদ্ধে প্রচার ও কুৎসা রটনার কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে বসেছিল।

কংগ্রেস তো বিতাড়িত সুভাষকে বিপক্ষ শিবিরের বর্জ্যপদার্থ বলে গণ্য করে— দুর্বিনীত অবাধ্য ছেলে। গান্ধীজির নির্দেশ না মেনে কয়েক বছর আগে নির্বাচন জিতেছিল। কম্যুনিস্ট পার্টির অবস্থা আবার সে সময় আরও সরেস। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তার দোস্ত! পূর্ব বৎসর, অর্থাৎ চল্লিশ সালে, একটি গোপন সামরিক চুক্তির মাধ্যমে রাশিয়া আর জার্মানী হয়েছিল ভাই-ভাই। সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ার অনুগত কম্যুনিস্ট পার্টিকে ভারত সরকার নিষিদ্ধ করে দেয়। কিন্তু বছরখানেকের মধ্যেই সে চুক্তি বাতিল করে হিটলার রাশিয়ার পশ্চিমাংশ আক্রমণ করে বসে। ফলে রাশিয়া মিত্রপক্ষে যোগ দিল। তৎক্ষণাৎ ভারতেও কম্যুনিস্ট পার্টির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হল। কম্যুনিস্ট পার্টি ব্রিটেন ও রাশিয়ার সংযুক্ত যুদ্ধকে জনযুদ্ধ (People's War) নামে প্রচার শুরু করে দিল। তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে উনিশশো একচল্লিশ সালের জুন মাস থেকে সুভাষ রূপান্তরিত হয়ে গেলেন শত্রুপক্ষের লোকে। সুভাষ রাশিয়ার বিরুদ্ধে একটা কথাও বলেননি; কিন্তু তাতে কী? ওই সময় থেকে কম্যুনিস্ট পার্টি — তখনো তারা দ্বিধাবিভক্ত হয়নি — ব্রিটিশ সরকারের সহযোগী হয়ে উঠল। ২৯.৯.১৯৪২ তারিখে — অর্থাৎ গান্ধীজির আগস্ট বিপ্লবের মাস দুই পরে 'পিপলস ওয়্যর' পত্রিকার কম্যুনিস্ট নেতা ভবানী সেন গান্ধীজি আগস্ট আন্দোলনে (করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে) গ্রেপ্তার হওয়ায় লিখলেন, "Who exploits the situation ? None but the anti-national Forward-Blockists, none but those adherents of the Traitor, Bose." [কংগ্রেসী নেতাদের গ্রেপ্তার হওয়ায় কে লাভবান হল? জাতীয়তা বিরোধী ওই ফরোয়ার্ড ব্লকের চ্যালা-চামুণ্ডার দল — সেই যারা বিশ্বাসঘাতক সুভাষ বোসের তল্পিবাহক।]

এই 'পিপলস ওয়ার' পত্রিকাতে গান্ধীজিকেও ক্রমাগত গালমন্দ করা হয়েছে, যেহেতু তিনি সেই বিশ্বাসঘাতক সুভাষচন্দ্রের প্রেরণাতেই — যদিও চার বছর পরে — আগস্ট-বিপ্লব অনুমোদন করেছিলেন। পি. সি. যোশী তখন ওই 'পিপলস ওয়ার' পত্রিকার সম্পাদক। ১৯.৭.১৯৪৩ সংখ্যায় সুভাষচন্দ্রের একটি কার্টুন ছাপা হয়েছিল: দেহটা গাধার, মুখটা সুভাষচন্দ্রের! গলায় দড়ি বেঁধে জাপ প্রধানমন্ত্রী তোজো গাধাটিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন, যেভাবে ব্রিটিশ সরকার তখন টেনে নিয়ে যাচ্ছিল স্বয়ং পি. সি. যোশীকে।

কংগ্রেস নেতারাও বিয়াল্লিশের আন্দোলনের আগে সমবেতভাবে সুভাষ নিন্দায় মুখর। সেসব পুরাতন দিনের ইতিহাস আজকের দিনের পাঠক সচরাচর জানেন না। ইতিহাসের স্তূপে তা চাপা পড়ে গেছে। তাই কয়েকজন তাবড় তাবড় কংগ্রেসি নেতার কিছু 'নথিকথিত' সুসমাচার এখানে সাজিয়ে দিই:

১২.৪.১৯৪২: প্রেস কনফারেন্সে "Nehru went to the extent of declaring that he would even oppose Subhas Ch. Bose and the Indian troops he had assembled from the prisoners of war with the Japanese." [নেহরু এতদূর অগ্রসর হয়েছিলেন যে, তিনি বললেন: সুভাষচন্দ্র বসু যদি জাপানীদের হাতে বন্দী ভারতীয় আজাদ হিন্দ বাহিনী নিয়ে ভারত প্রবেশের চেষ্টা করেন তবে তিনি তা প্রতিহত করতে উদ্যত হবেন — M. O. Mathai, My Days with Nehru]

আবুল কালাম আজাদ তাঁর 'ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম'-এ লিখেছেন, নেহরুর অভিমত ছিল বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেনকে পুরোপুরি মদত দেওয়া উচিত। তিনি বলতেন, 'The Japanese must be resisted. We are not going to embarrass the British War efforts in India.' [জাপানীদের রুখতেই হবে। ব্রিটিশ যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ভারতে তাদের কোনোভাবেই যেন বিড়ম্বিত করা না হয়।]

রাজাগোপালাচারী—যিনি স্বাধীন ভারতে গভর্ণর-জেনারেল হয়েছিলেন—এই সময়ে বলেছিলেন, 'সুভাষ একটি সুদৃশ্য রঙচঙে ফুটো নৌকা' (সন্তোষকুমার অধিকারী—'জন্মশতবর্ষে স্মরণ ও সমীক্ষা'—দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র, পৃঃ ৩০)

এবং ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ—যিনি স্বাধীনভারতে গোপালাচারীর পূর্বসুরী হিসাবে রাষ্ট্রপতির গদিতে চড়ে বসেছিলেন, তিনি বলেন, 'সুভাষের ওপর কোনওভাবেই নির্ভর করা যায় না —The most undependable Man. (তবে) ব্যতিক্রম শুধুমাত্র একজন — সুভাষের ভাষায় যিনি 'জাতির জনক', যাঁর সঙ্গে চিরকাল নীতিগত বিরোধ ছিল সুভাষচন্দ্রের। কংগ্রেসের তদানীন্তন সভাপতি মৌলানা আজাদ এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'I saw that Subash Bose's escape to Germany had made a great impression on Gandhiji. I found a change in his outlook .... His

admiration for Subhas Bose unconsciously coloured his view about the war situation."[আমি লক্ষ্য করছিলাম সুভাষ বোসের জার্মানীর দিকে মহানিষ্ক্রমণ গান্ধীজিকে প্রভূতভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে বেশ একটা পরিবর্তন আমার নজরে পড়ে ... সুভাষ বোসের প্রতি এই সশ্রদ্ধ মনোভাবের জন্যই নিজের অজ্ঞাতসারেই (এই সময় থেকে) গান্ধীজি নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে যুদ্ধ পরিস্থিতিটাকে দেখতে শুরু করেন—আবুল কালাম আজাদ : ইন্ডিয়া উইন্‌স্ ফ্রিডম।]

এই সময় থেকেই গান্ধীজির দৃষ্টিভঙ্গিতে 'সুভাষ—জওহার' মূল্যায়নে যে তিল-তিল করে পরিবর্তনের সূচনা হয়, তার প্রমাণ হিসেবে দু-একটি পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক দলিল এখানে পরিবেশন করে যাই। যাতে পাঠক বুঝে নিতে পারেন মৌলানার উপরোক্ত উক্তিটি কতটা যথার্থ।

উনিশশো বিয়াল্লিশের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের মাস দুই আগে (৪.৬.১৯৪২) প্রখ্যাত মার্কিন সাংবাদিক লুই ফিশার মহাত্মাজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি লিখেছেন, "আমি এসময় তাঁকে সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব যাচাই করতে কিছু প্রশ্ন করি। সুভাষচন্দ্র কয়েকবছর আগে গোপনে ভারত সীমান্ত পার হয়ে অক্ষশক্তির দ্বারস্থ হবার জন্য জার্মানীতে পালিয়ে গিয়েছিলেন। জাপানে এক বিমান দুর্ঘটনায় সেই সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু হয়েছে শুনে গান্ধীজি সুভাষচন্দ্রের মাকে একটি টেলিগ্রামে শোকবার্তা পাঠিয়েছিলেন। আমি তাই তাঁকে বলেছিলাম, 'বোসের মায়ের কাছে আপনার ওই শোকবার্তা পাঠানোর কথা শুনে আমি মর্মাহত (was rather shocked) হয়েছিলাম।'

গান্ধীজি প্রত্যুত্তরে বললেন, "Do you mean because I had responded to news that proved to be false?" [কেন ? যেহেতু ভ্রান্ত সংবাদের ওপর নির্ভর করে আমি আমার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলাম?]

—"না, তা নয়। But you regretted the passing of a man who went to Fascist Germany and identified himself with it."[যেহেতু আপনি এমন একজন ব্যক্তির জন্য সমবেদনা জানিয়েছিলেন যে-ব্যক্তি ফ্যাসিস্ট জার্মানীর শরণাপন্ন হয়েছিলেন এবং তাদের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন।]

"I did it," Gandhi asserted, "because I regard Bose as a patriot of patriots." [আমি শোকবার্তাটা পাঠিয়েছিলাম, তার কারণ বোস হচ্ছে দেশপ্রেমীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।]

আজাদ ঠিকই ধরেছিলেন; 'গান্ধীজির দৃষ্টিভঙ্গি আমূল পরিবর্তিত হয়েছিল। মাত্র চার বছর আগে যাঁর সম্বন্ধে গান্ধীজির বক্তব্য ছিল 'after all, Subhas is not an enemy of the country', তাঁকেই আজ বলছেন, Bose was a patriot of

patriots! ফিশারের ওই সাক্ষাৎকারে আমরা দেখতে পাই সত্যাশ্রয়ী গান্ধীজি প্রকারান্তরে নিজের ভুল স্বীকার করছেন।

চিরকাল অহিংসাব্রতে দীক্ষিত গান্ধীজি পুরোপুরি সশস্ত্র সংগ্রামী সুভাষকে স্বীকার করতে পারছেন না। তাই বলছেন, "He may be misguided. I have often opposed Bose. Twice I kept him from becoming President of the Congress. Finally he became President, although my views often differed from him. But suppose he had gone to Russia or to America to ask aid for India's freedom. Would that have made it better ?" [হয়তো সে ভ্রান্তপথে চলেছিল। আমি অনেকবার তার বিরুদ্ধাচরণ করেছি। দু-দুবার তাকে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হতে বাধাও দিয়েছি। সে অবশ্য দুবারই কংগ্রেস প্রসিডেন্ট হয়েছিল, যদিও তার দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আমার দৃষ্টিভঙ্গির মিল ছিল না। কিন্তু সে যদি ভারতের মুক্তিসন্ধানে রাশিয়া বা আমেরিকায় যেত তাহলে কি কিছু সুবিধা হত ?"]

লুই ফিশার ব্যারিস্টার গান্ধীর এই শেষ প্রশ্নটার জবাব দিতে পারেননি। অন্তত সে কথা তাঁর গ্রন্থে (দ্য লাইফ অফ মহাত্মা গান্ধী) উল্লেখ করেননি।

উনিশশো বিয়াল্লিশের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের মাস-চারেক আগে (৪.৪.১৯৪২) জওহারলাল আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ফ্র্যাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্টকে একটি আবেদনপত্র পাঠিয়ে দেন (A Bunch of Old Letters, Asia Pub. House, Bombay, 1958, P. 485)।

> "Dear Mr. President, I am venturing to write to you as I know that you are deeply interested in the Indian situation today and its reactions on the war ..... As you know we have struggled for long years for the independence of India, but the period of today made us desire above everything else that an opportunity should be given to us to organise a real national and popular resistance to the aggressor and invader."

অর্থাৎ আমেরিকা যদি অর্থসাহায্য করে অথবা চার্চিলকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করাতে পারে তাহলে জওহারলাল একটি ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনী গঠন করে নেতাজি এবং তাঁর আজাদ হিন্দ বাহিনীকে রুখে দেবার চেষ্টা করতে পারেন।

'এ বানচ অফ ওল্ড লেটার্স'-এ এ চিঠির জবাবটা ছাপা হয়নি। অনুমান করি মোতিলাল-তনয়ের এ পত্রটি মার্কিন প্রেসিডেন্টের ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে স্থানলাভ করেছিল। কারণ জওহারলাল হয়তো সেই বিখ্যাত সংস্কৃত শ্লোকটা জানতেন না —'ভিক্ষায়াং

নৈব নৈব চ'; কিন্তু রুজভেল্ট সবিশেষ জানতেন, তাঁর পূর্বসূরী জর্জ ওয়াশিংটন কীভাবে ইংরেজ সরকারকে মার্কিন মুলুক থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। জানতেন, স্বাধীনতা বীর্যশুল্কে কিনতে হয়। রক্তস্নানের মাধ্যমে।

উনিশশো বিয়াল্লিশের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের পর ফার্স্ট ক্লাস প্রিজনার হিসেবে জওহারলাল তাঁর 'ডিস্‌কভারি অব ইন্ডিয়া'-য় লিখেছেন : 'We told the Indian public that in spite of their indignation of the British policy, they must not interfere in any way with the operation of the British or Allied Arm Forces.' [আমরা ভারতবাসীকে বলেছিলাম ব্রিটিশ নীতির বিরুদ্ধে তোমাদের যতই বিরূপতা থাকুক, এ সময়ে তোমরা ব্রিটিশ বা মিত্রশক্তির সমর প্রচেষ্টায় কোনো বাধা দিও না।]

এখানে 'আমরা' কে? গৌরবে বহুবচন? গান্ধীজি সেকথা একবারও বলেননি, বলেননি কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট আবুল কালাম আজাদ। কারণ গ্রেপ্তার হবার আগেই হরিজন পত্রিকায় গান্ধীজি স্পষ্টাক্ষরে লিখেছিলেন (১০.৫.১৯৪২) "The time has come during the war, not after it, for the British and the Indians to be reconciled to complete separation from each other." [যুদ্ধকালীন বর্তমান অবস্থায়— না, যুদ্ধান্তে নয় — আজই ভারতবাসী ও ব্রিটিশদের মধ্যে একটা পরিষ্কার সমঝোতার প্রয়োজন, তাদের সম্পূর্ণভাবে বিযুক্ত করার প্রয়োজনে।]

'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের প্রস্তাব ওঠার আগেই জওহারলাল গান্ধীজিকে মনে মনে ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু 'ক্রাচ'-ছাড়া তিনি এক পাও চলতে পারেন না। তা নতুন একজোড়া ক্রাচের সন্ধান তিনি জেলে বসেই পেয়েছিলেন। সেকথা যথাস্থানে।

গান্ধীজি ইতিমধ্যে সুভাষের 'ব্রডকাস্ট' শুনেছেন, যদিও নেতাজির সেই বিখ্যাত ভাষণ — যাতে তিনি মহাত্মাজির আশীর্বাদ ভিক্ষা করেছিলেন, বর্মা রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হবার আগে, গান্ধীজিকে সর্বপ্রথম 'জাতির পিতা' বলে সম্বোধন করেছিলেন, সেই গুরুত্বপূর্ণ ভাষণটি তখনো শোনেননি তিনি। কিন্তু এটুকু বুঝতে পেরেছেন যে, সুভাষচন্দ্র যদি তাঁর সৈন্যদল নিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন তাহলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাফল্য দ্রুততর হারে আসবে। জওহারলালও হয়তো তা জানতেন, বুঝতেন; কিন্তু সেভাবে ভারতের স্বাধীনতা আসুক এটা মন থেকে চাইতেন না। সেক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রই হয়ে যাবেন ভারতের প্রধান রাষ্ট্রনায়ক। জওহারলালের এতদিনের স্বপ্ন মুছে যাবে। আগস্ট আন্দোলনের মাত্র দু-মাস আগের কথা লিখছেন মৌলানা আজাদ "I had divided Calcutta into a number of wards and started to recruit and organise bands of volunteers pledged to oppose Japan ... I was surprised to find that Gandhiji did not agree with me. He told me in

unqualified terms that if the Japanese army ever came to India, it would come not as our enemy but as the enemy of the British. He said that if the British left immediately, he believed that the Japanese would have no reason to attack India. I could not accept his readings and in spite of long discussions we could not reach agreement." [আমি ওই সময় শহর কলকাতাকে কয়েকটি ওয়ার্ডে বিভক্ত করে প্রতিরক্ষার জন্য কিছু স্বেচ্ছাসেবীর সংগঠন গড়ে তুলতে চেয়েছিলাম, যাদের ব্রত হবে জাপানকে প্রতিহত করা। .... আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম গান্ধীজি আমার সঙ্গে এ বিষয়ে আদৌ একমত হলেন না। উনি দৃঢ়তার সঙ্গে আমাকে তখনই জানিয়েছিলেন, জাপানী সৈন্যদল যদি আদৌ ভারতভূমিতে প্রবেশ করে তবে তা আমাদের শত্রু হিসেবে আসবে না। আসবে ব্রিটিশের শত্রু হিসেবে। উনি আরও বলেছিলেন, এখনই যদি ব্রিটিশ ভারত ত্যাগ করে চলে যায়, তাহলে জাপান আদৌ ভারত আক্রমণ করবে না। আমি তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। কিন্তু দীর্ঘসময় আলোচনা করেও আমরা কোনও ঐকমত্যে আসতে পারিনি।]

এ থেকে অনুমান করা যায় — না আজাদ, না গান্ধীজি —কেউই তখনো জানতে পারেননি যে, বর্মা রণাঙ্গনে যারা যুদ্ধ করছে, তারা আদৌ জাপানী নয়, নেতাজির নির্দেশে মুক্তিকামী ভারতীয় বাহিনী। স্বাধীনতার পরে আজাদের 'India wins Freedom' (1964, P. 73) থেকে ওই উদ্ধৃতি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কিন্তু এ কথা গান্ধীজি বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেই patriot of patriots-ও আসবে জাপানী সৈন্যের সঙ্গে। ফলে ভারতীয়দের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। মন খুলে সেকথা গান্ধীজি সহকর্মীদের বলতে পারছিলেন না বলেই ঐকমত্য হচ্ছিল না।

'চোরের মায়ের কান্না' জিনিসটা বোঝা যায়, কিন্তু চোরদের জমায়েতে 'না-চোর' মায়ের কান্নাটা কী জাতের হতে পারে তা কি কখনো ভেবে দেখেছেন? 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ক্রান্তিকারী মুহূর্তে জাতির পিতার হয়েছিল সেই অবস্থা। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ত্রিপুরী কংগ্রেসে যে 'Prodigal Son' তাঁকে ভূতলশায়ী করেছিল, বাস্তবে সে prodigious?

ইতিহাস বলছে ২৮.২.১৯৪২-এ নেতাজি জার্মানী থেকে প্রথম বেতারভাষণ দিয়েছিলেন। তার দিন পনেরো পরে (১৩. ৩.১৯৪২) বার্লিন থেকে বেতারতরঙ্গে সুভাষচন্দ্র বাপুজির কাছে আবেদন রাখেন কংগ্রেস যেন ক্রিপ্‌স্ মিশন প্রত্যাখ্যান করে। আজাদ বা জওহারলাল সে আবেদন শুনেছিলেন কিনা জানি না, শুনলেও কর্ণপাত করেননি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস — কোনো প্রমাণ আমি দাখিল করতে পারব না — গান্ধীজি স্বকর্ণে সে আবেদন না শুনলেও তাঁর কোনও বিশ্বস্ত আশ্রমিকের

মাধ্যমে একথা জেনেছিলেন। সুভাষের পরামর্শ মতো হোক-না-হোক, সহকর্মীদের আপত্তি সত্ত্বেও ক্রিপ্‌স্ প্রস্তাব মহাত্মাজি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। বলেছিলেন, যুদ্ধান্তে ভারতকে স্বায়ত্তশাসন দেবার ওই ক্রিপ্‌স্ প্রস্তাব হচ্ছে "A post-dated cheque on a crashing bank. "

আজাদের কী মনোভাব ছিল জানি না, জওহারলালের তৎকালীন মনোভাবের কথাটা বোঝা যায়, একজন বিদেশীর রচনায়। ১৯৬০ সালে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী গদিলাভের দীর্ঘদিন পরে লেওনার্ড মোসলেকে বলেছিলেন, "The truth is that we were tired men and were getting on in years too. Few of us could stand the prospect of going to prison again." [সত্যি কথা বলতে কি আমরা তখন ক্লান্ত। বয়স তো যথেষ্ট হয়ে গেছে। আবার জেলে যেতে হবে শুনলে আমাদের অনেকেই পশ্চাদপদ হত।]

বয়সের (৬০) ভারে ক্লান্ত ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী গদিতে চড়ে বসার বছর দেড়েক পরে (১৯৪৯) বুকপকেটে লাল গোলাপ ফুল গুঁজে লন্ডনবাসিনী মিসেস্ এডুইনা মাউন্টব্যাটেনকে লিখেছিলেন, "Life is a dreary business...feeling exhausted and terrible." [জীবন রসকষহীন ... প্রাণধারণ যেন দিনযাপনের গ্লানিতে পরিণত ... ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ে মনটা। অসহ্য।] দুদিনের মধ্যে মিসেস্ এডুইনা মাউন্টব্যাটেন জবাবে জানালেন, 'এডুইনা কবে নেহরুর সাক্ষাৎ পাবে ? ["Edwina wrote two days later ..... 'When would Edwina see Nehru ?" Janet Morgan সম্পাদিত Mountbatten, London, P. 429]

★ ★ ★

কংগ্রেস নেতৃবর্গের অনেকের অনিচ্ছা ও পণ্ডিত জওহারলালের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও কংগ্রেস অধিবেশনের পূর্বদিন Quit India বা 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাবের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। স্থির হল (৮.৮.১৯৪২) পরদিন কংগ্রেস অধিবেশনে ওই প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হবে। যে প্রস্তাব তাঁকে উত্থাপন করতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছিলেন সুভাষ — ঠিক চার বছর আগে—যখন হিটলারের আতঙ্কে ব্রিটিশ সিংহের লেজ পেটের ভিতর গুটানো এবং আমেরিকা, জাপান ও রাশিয়া ছিল নিরপেক্ষ।

সমস্ত রাত জেগে গান্ধীজি Quit India প্রস্তাব তৈরি করলেন। জওহারলালও বোধ করি সে রাতে আদৌ ঘুমাতে পারেননি। আতঙ্কে! পরদিন কী হয় কী হয় কী হয়! পরদিন কিন্তু গান্ধীজি প্রস্তাবটা প্রকাশ্য অধিবেশনে পেশ করতেই পারেননি। হেতুটা আপনারা সবাই জানেন। আগস্টের নয় তারিখের ভোররাত্রে সবাই গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন। গান্ধীজি সস্ত্রীক বন্দি ছিলেন পুনার কাছে আগা খাঁ প্যালেসে।

কংগ্রেসের যেসব চাঁই গ্রেপ্তার হলেন তার মধ্যে একজন জওহারলাল ! এমনটা যে হতে পারে তা স্বয়ং পণ্ডিতজিও আশঙ্কা করেননি। বিগত বছরখানেক তিনি তো কম্যুনিস্টদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে তথা ফাটিয়ে ক্রমাগত চীৎকার করে বলেছেন — 'জাপানকে রুখতে হবে ... সুভাষ বোসকে রুখতে হবে !' তাহলে ?

স্বয়ং গান্ধীজি নেহরুর গ্রেপ্তারে যে বিস্মিত হয়েছিলেন তার পাথুরে প্রমাণ আছে। গ্রেপ্তার হবার মাত্র পাঁচদিন পরে (১৪.৮. ১৯৪২) জেল থেকে মহাত্মাজি ভাইস্‌রয়কে লিখলেন, "In that misery (fear of impending ruin in China and Russia) Nehru tried to forget his old quarrel with imperialism ..... I have argued with him for days together. He fought against my position with a passion which I have no words to describe. But the logic of facts overwhelmed him. He yielded when he saw clearly that without the freedom of India that of the other two was in great jeopardy. Surely you are wrong in having imprisoned such a powerful friend and ally."[Michael Brecher : Nehru, A Political Biography, O.U.P., London 1959, P. 286]

অর্থাৎ—"চীন ও রাশিয়ার প্রত্যাসন্ন দুর্যোগের আশঙ্কায় নেহরু তো (ব্রিটিশ) সাম্রাজ্যবাদের প্রতি তার দীর্ঘদিনের বিদ্বেষের মনোভাব ভুলে যাবার চেষ্টাই করছিল।... এ বিষয়ে তার সঙ্গে আমি দিনের পর দিন তর্ক করেছি। সে আবেগের সঙ্গে আমার বিরুদ্ধে বির্তক করে গেছে। তার সে আবেগের বর্ণনা দেবার ভাষা আমার জানা নেই। কিন্তু তার যুক্তিতে সে ছিল অনড়। শুধুমাত্র আমি যখন বলতাম যে, ভারতের স্বাধীনতা ব্যতিরেকে ওই দুটি রাষ্ট্রের বিপদমুক্তি হতে পারে না, তখনই শুধু সে আমার সঙ্গে একমত হত। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের এমন একজন ক্ষমতাশালী বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষককে গ্রেপ্তার করে আপনারা কিন্তু ভুলই করলেন।"

প্রশ্ন হচ্ছে গান্ধীজি হঠাৎ এ চিঠি কেন লিখলেন বড়লাটকে? বিশ সাল থেকে বিয়াল্লিশ সাল — দীর্ঘ এই বাইশ বছরে জওহারলাল বহুবার কারাবরণ করেছেন। কোনও বারই তো গান্ধীজি ভারতের বড়লাটকে এমন চিঠি লেখেননি? প্রকারান্তরে এটা তো জওহারলালকে মুক্ত করে দেবার ইঙ্গিতপূর্ণ আরজি। দ্বিতীয়ত, এই দীর্ঘ বাইশ বছরে কখনোই তো মহাত্মাজির মনে হয়নি তাঁর ওই মানসপুত্র, যাকে তিনি বারে বারে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট করতে চেয়েছেন, যার ওপর গান্ধীজির সবচেয়ে বিশ্বাস, সবচেয়ে নির্ভর — সেই ব্যক্তি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের একজন ক্ষমতাশালী বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক। স্মরণে রাখা দরকার যে, জওহারলাল সম্বন্ধে মহাত্মাজি এই উক্তি করেছিলেন সুভাষচন্দ্রের সেই যুগান্তকারী (২.১০.১৯৪৩) বেতার ঘোষণার (যাতে তিনি

গান্ধীজির সঙ্গে আজীবনের মতদ্বৈধকে উপেক্ষা করে তাঁকে 'জাতির জনক' বলে সম্বোধন করে আশীর্বাদ ভিক্ষা করেছিলেন) প্রায় এক বছর আগে!

নিঃসন্দেহে ইতিমধ্যে জওহারলালের মানসিকতা সম্বন্ধে গান্ধীজির মূল্যায়ন আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেছে। বস্তুত জওহারলাল সম্বন্ধে বিয়াল্লিশ সালেই গান্ধীজির মোহভঙ্গ ঘটেছে!

স্তম্ভিত হয়েছিলেন জওহারলাল স্বয়ং। তিনি তো বরাবর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের বিরোধিতাই করে এসেছেন — ইংরেজকে বিব্রত করে কোনো আন্দোলন যাতে কংগ্রেস গ্রহণ না করে তার জন্য এতদিন প্রাণপাত করে এসেছেন। তাহলে কেন তাঁকে এভাবে গ্রেপ্তার করা হল?

জবাবটা তাঁকে গোপনে জানানো হয়েছিল কারাপ্রাচীরের নিভৃতে। যে সমাধানের কথা বোধ করি তীক্ষ্ণবুদ্ধি গান্ধীজিও বুঝতে পারেননি — কেন অমন সাম্রাজ্যবাদীর বন্ধুকে গ্রেপ্তার করা হল। বড়লাটের দূত বন্দি জওহারলালকে জানিয়ে গিয়েছিল — — যুদ্ধান্তে ভারতকে কিছুটা স্বায়ত্তশাসন দিতেই হবে, এটা ব্রিটিশ সরকার বুঝতে পেরেছে। যদি এই ক্রান্তিকারী সময়ে একমাত্র জওহারলালকে মুক্ত রেখে আর সবাইকে গারদজাত করা হয় তাহলে কার হাতে ভারতশাসনের দায়িত্ব দিয়ে যাবে ব্রিটিশ সরকার? সুভাষ বোস নিশ্চয় নয়! গান্ধী তো পদ্মপত্রে পানি। তাহলে? আজাদ? বল্লভভাই? রাজেন্দ্রপ্রসাদ? ইংরেজ সরকারের অধীনে 'ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস নিয়ে কে খুশি মনে মেনে নেবে ভারতের প্রধানমন্ত্রীত্ব?'

জওহারলাল বুদ্ধিমান। বুঝলেন। জেলারকে একটা মস্ত লিস্ট ধরিয়ে দিলেন— ইতিহাসের বই। তিনি জেলখানায় বসে বসে ভারতবর্ষকে আবিষ্কার করবেন : Discovery of India.

কারাপ্রাচীরের বাইরে তখন "The Govt. used British troops and aircraft against mobs,—machine gunning crowds from the air ..... Bose, the only one with a clear - cut view of the world, was far away in Europe nurturing his plans, to liberate India from outside. [ভারত সরকার ব্রিটিশ সৈন্য বিমানের সাহায্যে তখন আকাশ থেকে বিদ্রোহী ভারতীয় জনতার ওপর মেশিনগান চালাচ্ছে। ... বোস, একমাত্র যাঁর ছিল বিশ্ব রাজনীতির ওপর অনাবিল স্বচ্ছ দৃষ্টি, তিনি তখন ইয়োরোপে। বাইরে থেকে ভারতকে স্বাধীন করার নানান পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে একাগ্রচিত্ত । — Michael Edwards, The Last Days of British Raj, P. 76 ও 82]

দীর্ঘ তিন বছর ধরে পণ্ডিতজি লিখে চলেছেন সেই প্রকাণ্ড বইটি : The Discovery of India – 'ভারত আবিষ্কার'। সুন্দর, সাবলীল সহজ অ্যাংলো-স্যাক্সন রচনাশৈলীতে

একটি ক্রমাগত ভ্রান্তিভরা ইতিহাস-আশ্রিত তৃতীয় শ্রেণীর গ্রন্থ। যাতে ন্যায়নিষ্ঠ ইতিহাসবেত্তার প্রত্যাশিত নিরপেক্ষ, নৈর্ব্যক্তিক, সত্যসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গির একান্ত অভাব। যেখানে ভারত-ইতিহাসের মহাসমুদ্রের পশ্চাদপটে বারে বারেই দেখা দিয়েছে কিছু পারিবারিক ভাসমান উদ্ভিদ: নেহরু পরিবার! একটা কথার উল্লেখ করলেই এ কথার যাথার্থ্য প্রতীয়মান হবে। ওই ৭১০ পৃষ্ঠার গ্রন্থে, যাতে স্বাধীনতা আন্দোলনে নেহরু পরিবারের প্রসঙ্গ গানের ধুয়োর মতো বারে বারে ফিরে এসেছে — যেখানে 'নেতাজি' নামক কোনো ব্যক্তি বা তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজের নামোল্লেখ করা হয়নি, সেই ঢাউস কেতাবে তিনবার মাত্র 'সুভাষচন্দ্র' নামের এক ভদ্রলোকের উল্লেখ আছে। ৫০৮ পৃষ্ঠায় লেখা আছে : "Subhas Bose was the President of the Congress ..... There was a big difference in outlook between him and others in the Congress Executive and this led to a break early in 1939 ... The Congress Executive took the very unusual step of taking disciplinary actions against him who was an Ex-President." [সুভাষবাবু কংগ্রেসের সভাপতি হলেন .... কিন্তু কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতির সঙ্গে তাঁর মতের ঘোরতর অনৈক্য হল। শেষ পর্যন্ত ১৯৩৯ সালে কংগ্রেসে ভাঙন ধরল ..... কংগ্রেস কার্যনির্বাহক সমিতি—সচরাচর যা হয় না — এক প্রাক্তন-সভাপতির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হলেন।]

ঐতিহাসিক অনুক্ত রাখলেন : অপরাধীর অপরাধটা কী ছিল! গান্ধীজির নির্দেশ অমান্য করে, গান্ধীজি সমর্থিত প্রার্থী সীতারামাইয়াকে বৈধ নির্বাচনে পরাস্ত করাটাই যে ছিল ওই প্রাক্তন সভাপতির মূল অপরাধ একথা বলতে ভুলেছেন ইতিহাসবেত্তা জওহারলাল!

আর একবার ৫৬৯ পৃষ্ঠায় :

"There was a small group which was indirectly pro-Japanese .... they were influenced by the broadcasts made by Subhash Ch. Bose who had secretly escaped from India. [সে সময়ে (ভারতে) কিছু লোক হয়ে পড়েছিল জাপানীদের প্রতি সহানুভূতিশীল, মূলত সুভাষচন্দ্র বোসের বেতার ভাষণে প্রভাবিত হয়ে। এই বোস ইতিপূর্বেই গোপনে ভারত থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন।]

এই তথাকথিত 'পলায়ন' যে কী ভয়ঙ্কর, রোমাঞ্চময় দুঃসাহসিক অভিযান — একমাত্র নানাসাহেব, বীর সাভারকার, রাসবিহারীর মহানিষ্ক্রমণের সঙ্গেই তুলনীয় এবং তারপর ব্রিটিশ আইল্‌স্ তথা আফ্রিকা বেষ্টন করে ডুবোজাহাজে চেপে পূর্ব এশিয়ায় অবতীর্ণ হওয়া যে সহস্রাব্দীর মধ্যে একজন বিপ্লবীই করতে পেরেছেন সে কথাও ইতিহাসবিদ বলতে ভুলেছেন।

তৃতীয়বার ৫৩৫ পৃষ্ঠায় : "In spite of past history .... we were eager to offer our co-operation in the war and especially for the defence of India." [অতীত অত্যাচারের ইতিহাসের কথা ভুলে ... যুদ্ধকালে আমরা ব্রিটিশকে সাহায্য করতেই উদগ্রীব ছিলাম, বিশেষ করে তারা যাতে ভারতবর্ষকে রক্ষা করতে পারে।]

কী অদ্ভুত কথা! এই উই (we) পোকাটা কে? গোটা ভারত তখন গজরাচ্ছে '— এ যুদ্ধে এক পাই নয়, এক ভাই নয়'! উনিশশো বিয়াল্লিশের আন্দোলনে জনতার ওপর ব্রিটিশ সৈন্যের মেশিনগান চালানোর প্রতিবাদে এটাই ছিল গোটা ভারতের স্লোগান। ব্রিটিশের 'ওয়্যর ফান্ডে' কেউ যেন এক পয়সা চাঁদা না দেয়। ওয়্যর রিক্রুটমেন্ট ক্যাম্পে কেউ যেন তার ভাইকে যেতে না দেয়।

হ্যাঁ, ব্যতিক্রম কি ছিল না? ছিল। জওহারলালের মতো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কিছু বন্ধু আর মুষ্টিমেয় কম্যুনিস্ট পার্টির চ্যালা-চামুণ্ডা। কলকাতা শহরে লাল টুপিপরা, গলায় লাল গামছা বেঁধে কমরেডরা মিছিলে বেরিয়ে পড়তেন একচল্লিশ-বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশে (যখন বর্মা রণাঙ্গনে আজাদ হিন্দ ফৌজের দল ব্রিটিশ মার্কিন সৈন্যদলের বিরুদ্ধে ভারতোদ্ধারের জন্য রক্তক্ষয়ী মরণপণ যুদ্ধ করছে) তাঁরা কোরাসে গাইতেন :

"কমরেড, ধরো হাতিয়ার—ধরো হাতিয়ার!
স্বাধীনতা-সংগ্রামে নহি আজ একলা।
বিপ্লবী সোভিয়েত, দুর্জয় মহাচীন,
সাথে আছে ইংরেজ, নির্ভীক মার্কিন।"

একটা কথা মনে রাখবেন —'মহাচীন' বলতে কিন্তু ভারতীয় কম্যুনিস্টপার্টির নেতাদের কাছে তখন 'মাওজে দং'-এর বিপ্লবী চীন নয়; সাম্যবাদের শত্রু চিয়াং কাই-শেক-এর কুয়োমিনটাং চীন!

ওই মুষ্টিমেয় ডাঙ্গে-রণদিভে-জ্যোতি বসুর কিছু চ্যালা-চামুণ্ডা আর জওয়াহরলালের মতো কিছু 'হ্যারো'র প্রাক্তন ছাত্র — মহাত্মা গান্ধীর মতে যিনি ছিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজবাদের একজন ক্ষমতাশালী বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক—তাঁরাই ছিলেন ওই 'we' বা 'আমরা'।

যাববেদা কারাগারের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত অতিথি-আলয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বন্ধুটি যখন অতীত ইতিহাসকে কালিমালিপ্ত করায় ব্যস্ত, ঠিক সেই সময়ে তাঁর নয় বৎসরের অনুজ সহযোদ্ধা ভারতের নয়া ইতিহাস রচনা করে চলেছেন। ব্রিটিশ আর মার্কিন গোয়েন্দাদের নাকে ঝামা ঘষে দিয়ে মিত্রশক্তির পয়লা নম্বর শত্রু জার্মানীর কিয়েল বন্দর থেকে রওনা দিলেন (২.২.১৯৪৩) জার্মানী-মেক ডুবোজাহাজে। সঙ্গী একমাত্র

একজন ভারতীয় তরুণ, এঞ্জিনিয়ার আবিদ হাসান। স্কটল্যান্ডের উত্তর উপকূল ঘুরে, মাইন-আকীর্ণ মহাসমুদ্রে দুজনে চলেছেন পৃথিবীর পূর্বপ্রান্তে। আফ্রিকা মহাদেশ বেষ্টন করে মাডাগাস্কার দ্বীপে পৌঁছালেন ৮৫ দিন পরে (২৮.৪.১৯৪৩)। এখানে একটি জাপানী ইউবোটে উঠে সূর্যের মুখ আবার দেখলেন সিঙ্গাপুরে। এই অভিযাত্রা নিঃসন্দেহে ইনক্রেডিবল ভয়েজ—অবিশ্বাস্য সমুদ্রযাত্রা! পৃথিবীর ইতিহাসে সাম্রাজ্যবাদীদের কোনও পয়লা নম্বর শত্রু — তা সে পর্তুগীজ-ডাচ-ফরাসী বা ইংরাজ যাই হোক — এ কৃতিত্ব কখনো কোনোদিন দেখাননি। 'ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া'র লেখক সে কথা রচনাকালে জানতেন না; কিন্তু বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ভারত স্বাধীন হবার পর। তখন কিন্তু লেখক এ কথা অস্থিতে অস্থিতে অবগত ছিলেন। কিন্তু পরিশিষ্টেও উল্লেখ নেই নেতাজির।

জাপানে শবরীর প্রতিক্ষায় দিন গুনছিলেন দীর্ঘ আঠাশ বছর ধরে মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু। রেঙ্গুনের 'ক্যাথে হল'-এ সুভাষবরণ করলেন মহানায়ক। সুভাষ গড়লেন আজাদ হিন্দ বাহিনী।

তাঁর সেই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম কাহিনী সবিস্তারে লিখেছি ইতিপূর্বেই — 'আমি নেতাজিকে দেখেছি' গ্রন্থে। এখানে প্রাসঙ্গিকতার দাবিতে দু-একটি কথার মাত্র উল্লেখ করব।

পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম নারী সৈন্যবাহিনী গঠিত হল আজাদ হিন্দ-এ। 'উইমেনস লিব'-এর প্রথম স্বীকৃতি। রাশিয়া বা চীনের মেয়েরা সে দেশের জনযুদ্ধে এ মর্যাদা পায়নি। প্রতিটি নারী সৈনিকের জন্য সর্বাধিনায়ক স্যাংশন করেছিলেন একটি করে স্পেশাল বুলেট! মেয়েরা তাদের ব্লাউজের ভিতর সেটা লুকিয়ে রাখত। আরতি নায়ারের জবানবন্দিতে তা জেনেছি। সে সব কথা ইতিপূর্বেই লিখেছি। ওই স্পেশাল বুলেটটির ব্যবহার হত একবারে শেষ ফায়ারিং হিসেবে। শত্রুর হাতে বন্দি হবার দুর্ভাগ্য অনিবার্য বুঝতে পারলেই মেয়েরা সেটা ব্যবহার করত। নিজের দেহটা শত্রুর হাতে অপবিত্র হবার উপক্রম হলেই, দেহপিঞ্জর থেকে বিদ্রোহিনীর প্রাণবিহঙ্গকে নীলাকাশে মুক্ত করে দেবার ছাড়পত্র! এ পরিকল্পনা যাঁর মস্তিষ্কে উদ্ভূত সেই পক্ষিরাজের পিঠে সওয়ার দুয়োরানীর সন্তানকে রাজপুত্র বলব না? এ বাহিনীর নাম ছিল : রানী অব ঝাঁসি বাহিনী।

পুরুষদের সৈন্যদলকে নেতাজি প্রথম পর্যায়ে তিনটি ব্রিগেডে বিভক্ত করলেন। মহিলাদের ক্ষেত্রে নামকরণের সময় অতীতমুখী হলেও এক্ষেত্রে তিনি তা হলেন না। রাণাপ্রতাপ, শিবাজী, গুরু গোবিন্দ্ বা টিপু সুলতানের নামাঙ্কিত বাহিনী নয়; ব্রিগেডের অভিধা হল সহযোদ্ধাদের নামে — যে কংগ্রেস থেকে তিনি বিতাড়িত হয়েছিলেন সেই কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতাদের নামে : গান্ধী ব্রিগেড, আজাদ ব্রিগেড, নেহরু ব্রিগেড!

নেহরু ব্রিগেড! সেই হ্যারো-প্রভাবিত ফেবিয়ান সোশালিস্ট-কেরিয়ারিস্ট! যাঁর সম্বন্ধে তাঁর জীবনীকার বি. আর. নন্দ লিখেছিলেন "Nehru was the last Englishman to rule India", যিনি নিজের সম্বন্ধে লিখেছেন "I am perhaps more an Englishman than an Indian and I looked upon the world almost from an Englishman's standpoint.' [The Hindustan Times, 3.9.1965]
ওই 'নেহরু ব্রিগেড' নামকরণে প্রমাণ হয় : নেতাজি ছিলেন সম্পূর্ণ নিরাসক্ত। শ্রীমদ্ভগবৎগীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত স্থিতপ্রজ্ঞ! তিনি অনসূয় — মহাত্মা!
ভুল বোঝাবুঝি এড়াতে এখানে বরং বলা দরকার যে, আজাদ হিন্দ-এ একটা 'সুভাষ ব্রিগেড'ও ছিল — সে নামকরণ করেছিলেন পরবর্তীকালে প্রধান সেনাপতি জেড. এম. কিমানি।

★ ★ ★

নব সহস্রাব্দীর উষালগ্নে আজ এই জীবনসায়াহ্নে যখন অতীতের দিকে ফিরে তাকাই তখন বুঝতে পারি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সম্বন্ধে আমাদের মূল্যায়নের মূলেই ছিল একটা হিমালয়ান্তিক ভ্রান্তি। আপনাদেরও তা ছিল কি না জানি না, হয়তো আপনারা স্বচ্ছদৃষ্টিতে সমস্যার সঠিক মূল্যায়নই করেছিলেন। আমি অন্তত তা পারিনি। আজ অকপটে স্বীকার করব। হয়তো এই স্বীকারে কিছুটা পাপস্খালন হবে।
আমার এবং আমাদের বন্ধুদের ধারণা ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ছিলেন মূলত দুই ভাগে বিভক্ত : দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী। এছাড়া মডারেটরা ছিলেন মাঝামাঝি। এ পর্যন্ত কিছু ভ্রান্তি নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের আরও বিশ্বাস ছিল যে, ওই দক্ষিণ ও বামপন্থীদের মৌল পার্থক্যটা হচ্ছে পন্থায় — প্রথম দল চাইছেন অহিংস-অসহযোগের পন্থায় স্বরাজ আনতে, আর সেই দলের দলপতি মহাত্মা গান্ধী। অপরপক্ষে বামপন্থীরা সশস্ত্র সংগ্রামের পথে যেতে চাইছেন একই লক্ষ্যে। এই বামপন্থী দলের নেতা যুগে যুগে বদল হয়েছে। নানাসাহেব, তাঁতিয়া তোপী, ঝাঁসির রানীর পরবর্তী যুগে এসেছিলেন শ্রীঅরবিন্দ, বালগঙ্গাধর, রাসবিহারী, বাঘা যতীন, মাস্টারদা এবং শেষমেষ নেতাজি। এখানেও কোনো ভ্রান্তি নেই। ভুলটা হচ্ছে যে পার্থক্যটা 'মিনস'এ নয় 'এন্ডস'এ; অর্থাৎ সংগ্রাম-কৌশলের তারতম্যে নয় — হিংসা-অহিংসার নয় — 'লক্ষ্যে'র পার্থক্যে।
দক্ষিণপন্থীরা চাইছিলেন সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের অধীনে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার — ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস — যেমন ছিল এবং আজও আছে অস্ট্রেলিয়ার, কানাডার। তাদের জাতীয় পতাকার একপ্রান্তে 'ইউনিয়ন জ্যাক'-এর ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। কারণ

তারা 'গড সেভ দ্য কিং' মন্ত্রে বিশ্বাসী। অপরপক্ষে বামপন্থীরা চাইছিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মোহজাল থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হতে। ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস নয়, পূর্ণ স্বাধীনতা। যেমন আদায় করেছিলেন আমেরিকার তরফে জর্জ ওয়াশিংটন — ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সে দেশ থেকে সম্পূর্ণ তাড়িয়ে।

গান্ধীজির তিন দশকব্যাপী কংগ্রেস-নেতৃত্বের কালে অনেক বামপন্থী তাঁর নির্দেশ মেনে নিয়ে অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। তাঁদের মোহমুক্ত হতে দেরি হয়নি। কারণ প্রতিবারই যখন অহিংস-আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠেছে তখনই কোনো না কোনো অজুহাতে গান্ধীজি সংগ্রাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। এঁদের মধ্যে দুজনের কথা বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য। প্রথমত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। গান্ধীজির নির্দেশে তিনি তাঁর অগাধ সম্পত্তি, প্র্যাকটিস, ব্যয়বহুল জীবনযাত্রা রাতারাতি ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু মোহমুক্ত হতে তাঁর বিলম্ব ঘটেনি। সর্বস্বান্ত হবার পরে দেশবন্ধু বুঝতে পারলেন গান্ধীজির সঙ্গে তাঁর পার্থক্যটা পদ্ধতির নয় — লক্ষ্যের। দেশবন্ধু চাইছিলেন পূর্ণ স্বাধীনতা; গান্ধীজি: ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস!

অনেকেই জানেন না এই সময় চিত্তরঞ্জন লেনিনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন মাদাম কামার মাধ্যমে। উনিশশো বাইশ সালে চতুর্থ আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য সুভাষচন্দ্র এবং দেশবন্ধুর পুত্র চিররঞ্জন দাস লেনিনের আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কারও যাওয়া হয়নি। স্টুটগার্টের ওই সম্মেলনে লেনিনের উপস্থিতিতে ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করেছিলেন মাদাম কামা।

আবার ওই গয়া কংগ্রেস অধিবেশনেই দেশবন্ধু বলেছিলেন, শুধু ভারত থেকে ব্রিটিশ বিতাড়নই আমাদের লক্ষ্য নয়, আরও জরুরি কাজ হল সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে এশিয়ার জাতি সমবায়ে ভারতের সক্রিয় অংশগ্রহণ (Even more important is participation of India in the great Asiatic Federation).

রাজনৈতিক গুরুর এই আদেশ সুভাষ পালন করেছিলেন দুই দশক পরে। ১৯৪৩ সালে নভেম্বর মাসে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সব কয়টি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তির এক মহাসম্মেলন আহ্বান করেছিলেন তিনি। সভাপতি ছিলেন নেতাজি — আটটি দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বাত্মক যুদ্ধপ্রস্তুতি (টোটাল মোবিলাইজেশন) এবং সামরিক প্রশিক্ষণ দেবার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আই. এন. এ. সৈন্যদের সঙ্গেই এই সমরশিক্ষা শিবিরের কাজ হত।

এশিয়ায় মুক্তি-সংগ্রামের বিজয়সূর্যের প্রথম উদয় ভিয়েতনামে। কিন্তু ভিয়েতনামীদের একক শক্তিতে সে বিজয় আসেনি। ভিয়েতনামের প্রথম প্রতিরোধ সময়ে হো চি

মিন-এর গেরিলাবাহিনী ছিল অতি ক্ষুদ্র একটা দল। মাত্র ৩৪ জন সদস্য নিয়ে সে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন হো চি মিন [Gray Lockhard : The Origin of the People's Army in Vietnam, Allen & Unwin, London, P. 272] কিন্তু ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৫ মাত্র একটি বছরে এই ছোট্ট গেরিলা বাহিনী রূপান্তরিত হয়েছিল বিশাল গণফৌজে। ওই বছরেই আগস্ট মাসে হো চি মিন ভিয়েতনামকে সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রিপাবলিক বলে ঘোষণা করেছিলেন। সাংবাদিক পবিত্রকুমার ঘোষ লিখেছিলেন, 'নেতাজি ছিলেন হো চি মিন-এর শক্তির উৎস। .... হো চি মিনের সামান্য শক্তিকে বিজয়ীশক্তিতে পরিণত করতে সবচেয়ে বেশি অবদান ছিল নেতাজির।' [পবিত্রকুমার ঘোষ: বিশ্বযুদ্ধের পর নেতাজি, বর্তমান পত্রিকা]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, গান্ধীজির অবিসংবাদিত নেতৃত্বে আস্থা রেখে বামপন্থীদের কিছু সর্বজনবরেণ্য নেতা মহাত্মাজির অহিংস-অসহযোগ নীতিতে মাঝে-মাঝে সংগ্রামপদ্ধতি পরিবর্তন করেছেন। গান্ধীজি তাঁর সংগ্রাম প্রত্যাহার করে নেবার পর ফিরে এসেছেন তাঁদের বামপন্থায় ৷তিলক মহারাজ বা শ্রীঅরবিন্দ গান্ধী-অভ্যুত্থানের পূর্বযুগের লোক, তাই তাঁদের সম্বন্ধে এ প্রশ্ন ওঠেই না, আর লালা লাজপৎ অকালে মারা গেলেন। বাদবাকি নাম করা বামপন্থী নেতারা — যাঁরা রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রাণপাত করেছেন — রাসবিহারী, বাঘাযতীন, হরদয়াল, বীর সাভারকর, মাস্টারদা প্রভৃতি কোনোদিনই গান্ধীজির 'অহিংস অসহযোগ' মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেননি। দেশবন্ধুও অকালে প্রয়াত হলেন, না হলে তাঁর নতুন গড়া স্বরাজ্যপার্টি কী রূপ নিত — গান্ধীজি পরিচালিত কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সংঘাত বাধতো কি না — বলা যায় না। একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছেন : দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র।

তিনি যতদিন সম্ভব গান্ধীজির নেতৃত্ব মেনে চলেছেন। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, সুভাষচন্দ্রের বিশ্বাস ছিল তাঁর সঙ্গে গান্ধীজির পার্থক্যটা শুধু পদ্ধতিগত — মূল লক্ষ্যের নয়। অর্থাৎ দক্ষিণ-বাম দু-দলেরই মূল লক্ষ্য : পূর্ণ স্বাধীনতা — ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সম্পর্কবর্জিত। সুভাষ নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিলেন যে, গান্ধীজি ব্যতিরেকে দ্বিতীয়শ্রেণীর দক্ষিণপন্থী নেতাদের — জওহারলাল, আজাদ, প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, পন্থ, রাজাগোপালাচারী, প্রভৃতির শেষ লক্ষ্য ছিল 'ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস্'— ব্রিটেনের তাঁবেদারিতে স্বায়ত্তশাসন! ১৯৩০-এর 'পূর্ণ-স্বরাজ' ঘোষণাটা ছিল নিতান্ত অভিমানের কথা। বাসে-ট্রামে বিড়ম্বিত গৃহিণী যেমন তার কর্তাকে 'আল্‌টিমেটাম' দেয়: "এক বছরের মধ্যে তুমি যদি একটা স্কুটার না কেন তাহলে আমি কিন্তু গলায় দড়ি দেব।" এক বছরের ভিতর স্কুটার কেনা হয়ে ওঠে না। গৃহিণী বড় জোর বৎসরান্তে একদিন অভিমান করে উনুনে আগুন দেয় না। ফলে কর্তাকে

সেদিন দোকান থেকে খাবার কিনে আনতে হয়। রুটি-তরকা নয়। চাওমিন, চিলি-চিকেন! বহ্বারম্ভে শুরু হলেও মশারি-ফেলা জনান্তিকে লঘুক্রিয়ায় মিটে যায় ঝগড়া!

আমার ব্যক্তিগত ধারণা সুভাষচন্দ্রের বিশ্বাস ছিল, দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে একমাত্র গান্ধীজিই আন্তর-গভীরে কামনা করেছিলেন ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা! কিন্তু তাঁর সহকর্মীদের সেকথা বুঝতে দেননি। দিলে, অনেক আগেই কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যেত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কংগ্রেসের নেতৃত্বভার যদি ক্ষমতা বদলের সেই ক্রান্তিকারী লগ্নে গান্ধীজির হাতে থাকত তাহলে তিনি কিছুতেই লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে স্বাধীন ভারতের প্রথম বড়লাট হিসাবে মেনে নিতেন না। কায়েদ-এ আজম জিন্নার যেটুকু হিম্মৎ ছিল, জওহারলালের তা ছিল না। হবে কী করে? গান্ধীজি যে তখন মানসিকভাবে কংগ্রেসের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে 'হিন্দু-মুসলমান' সম্প্রীতিতে আত্মনিয়োগ করেছেন। জওহারলালের এতদিনের ক্রাচ জোড়া খোয়া গেছে। তাই লর্ড আর লেডি মাউন্টব্যাটেনের নতুন ক্রাচজোড়ায় ভর দিয়ে জওহারলাল স্বাধীন-ভারতের গদিতে উঠে বসলেন।

★ ★ ★

ফেলে-আসা দিনগুলোর স্মৃতিচারণে এখানে আমার ব্যক্তিগত একটা দিনের কথা বলতে ইচ্ছে করছে। এ অভিজ্ঞতার তির্যক প্রতিফলন হয়েছে আমার লেখা 'অরণ্যদণ্ডক'-গ্রন্থে। সেখানে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাগুলি আমি কিছু কল্পিত নায়কের ওপর আরোপ করেছি। পুনরুক্তি দোষ হচ্ছে জেনেও বাস্তব অভিজ্ঞতাটা এখানে লিপিবদ্ধ করি :

কৃষ্ণনগরের মহাবিপ্লবী চারণকবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের স্নেহধন্য হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তখন আমি কৃষ্ণনগর কলেজে বি. এস্-সি. পড়ি। সময়-সুযোগ হলেই জলঙ্গী নদীর তীরে বিজয়দার বাড়িতে চলে যেতাম সন্ধ্যার সময়। ১৯৪৩ সালে। সুধীর (বাঙলার অধ্যাপক ডঃ সুধীর চক্রবর্তী) এবং তার দাদা, দেবুদা, (শ্রীদেবপ্রসাদ চক্রবর্তী — বর্তমানেও যিনি বিজয়দা-প্রতিষ্ঠিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম-তথা-পাঠাগার'-এর অধ্যক্ষ, অশীতিপর অকৃতদার একনিষ্ঠ সমাজসেবী) এবং আরও কয়েকজন আসতেন। বিজয়দা কট্টর গান্ধীপন্থী। স্বাধীনতা-সংগ্রামী। উনিশশো বিয়াল্লিশ সালের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে বিজয়লাল গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। তারপর ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য মুক্ত হয়ে কৃষ্ণনগরে ফিরে এসেছিলেন। আমরা, কলেজের ছেলেরা, গাঁদা ফুলের মালা নিয়ে তাঁকে কৃষ্ণনগর স্টেশনে অভ্যর্থনা জানাতে গিয়েছিলাম। সেই তাঁকে প্রথম দেখি। শালপ্রাংশু, মহাভুজ, পুরুষসিংহ। কারাগারে স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়েছে কিন্তু তাঁর দীপ্তি ও পৌরুষটুকু কেড়ে নিতে পারেনি ইংরেজের কারাগার।

উনি থাকতেন কৃষ্ণনগর শহরপ্রান্তে জলঙ্গী নদীর ধারে। আমরা সেখানেই সন্ধ্যাবেলা সমবেত হতাম। একটি প্রার্থনাসভা হত। গান্ধীজির প্রার্থনাসভার অনুকরণে। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের সেই স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বর্ণনা। তারপর কিছু গান। রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুল অথবা দ্বিজেন্দ্র গীতি। সুধীরের গলা খুব মিষ্টি। অধিকাংশ দিন সেই গাইত। কোনোদিন-বা লালন ফকিরের গান। তারপর আমরা 'দেশের-কথা' নিয়ে কিছু আলোচনা করতাম — অর্থাৎ বিজয়দার উপদেশ শুনতাম।

উনি প্রায়ই বলতেন, এক দশকের ভিতরেই ভারতবর্ষ পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করবে— এ একেবারে ধ্রুবসত্য!

আমাদের মধ্যে কে-একজন একদিন বেমক্কা প্রশ্ন করে বসল, কিন্তু স্বাধীন ভারতবর্ষের স্বরূপটা কী রকম হবে, দাদা? ইংরেজ যেদিন চলে যাবে সেদিন এই উনিশশো তেতাল্লিশের মন্বন্তর পাড়ি দিয়ে আমাদের প্রাণশক্তির কিছুও কি অবশিষ্ট থাকবে?

বিজয়দা হেসে বলেছিলেন, মাত্র দুবছরেই ভুলে গেলে সভ্যতার সংকট?

বোকার মতো আমি বলেছিলাম, বুঝলাম না।

বিজয়দা বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের শেষ জন্মদিনে উত্তরায়ণ-প্রাঙ্গণে আশ্রমবাসীদের সম্বোধন করে বলেছিলেন, 'ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে? কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে? একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে, তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে? জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল .... কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ বলে মনে করি।'

আমি অবাক হয়ে বলেছিলাম, এই এতখানি মুখস্ত করে রেখেছেন?

বিজয়দা সস্নেহ ধমক দিয়ে বলেছিলেন, বোকা ছেলে! জপের বীজমন্ত্র কি কেউ মুখস্ত করে রে? ও মুখস্ত হয়ে যায়।

বীজমন্ত্র! বিজয়দার মতো সত্যাশ্রয়ী স্বাধীনতা-সংগ্রামীর এটাই ছিল বীজমন্ত্র। আমাদের কাছে অতটা না হলেও ওই মন্ত্রটাকে অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করতাম তরুণ বয়সে।

তাই বিশ্বাস হয়েছিল 'ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশই' হয়েছিল রেঙ্গুনের ক্যাথে-হল-এ। পূর্বাচলেই সূর্যোদয় হয়েছে বটে! তার সোনালি আলো ভারতবর্ষে এসে পৌঁছতে আর দেরি নেই!

সেদিন আমাদের মধ্যেই কে যেন জিজ্ঞেস করে বসেছিল—কিন্তু স্বাধীন ভারতবর্ষে শাসনতন্ত্রের রূপটা কেমন হবে, বিজয়দা? আমরা কি জার্মানি বা ইটালির মতো একনায়কত্বের দিকে ঝুঁকব, না রাশিয়ানদের মতো সমাজতন্ত্রবাদের দিকে?

বিজয়দা বলেছিলেন—কেন? ওই দুটি রাস্তা ছাড়া আর বুঝি কিছু নজরে পড়ে না?

— আর কোন রাস্তা?

— বলছি, কিন্তু তার আগে বল তো দেখি স্বাধীন ভারতের কর্ণধার কে হবেন? আবার আমাদের মধ্যে কে যেন বলে, হয় মহাত্মাজি, না হলে পণ্ডিতজি! আর আজাদ-হিন্দ বাহিনী নিয়ে ফিরে আসতে পারলে হয়তো উনিই ...

— তবেই দেখ, স্বাধীনতার পর ভারতের ভাগ্যবিধাতা কে হবেন তাই যখন বলা যাচ্ছে না, তখন তিনি ফেডারেল স্টেটসের প্রেসিডেন্ট হবেন, না পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রী হবেন কিংবা একনায়ক রাষ্ট্রের ডিকটেটর হবেন তা কেমন করে বলব? তারপর একটু ভেবে নিয়ে বলেন—মহাত্মাজির কথা বাদ দাও — তাঁর যা শরীরের অবস্থা, তিনি আর কদিন? সুতরাং স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনা করবেন হয় পণ্ডিতজি, নয় সুভাষচন্দ্র। কে করবেন, তার উপর নির্ভর করবে স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থার স্বরূপ। জানো তোমরা, ১৯৩৩ সালে, মানে এই বিশ্বযুদ্ধ বাধার বছর ছয়েক আগে, পণ্ডিতজি এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছিলেন — 'আমি বিশ্বাস করি, পৃথিবীর সামনে আজ দুটি মাত্র পথ খোলা আছে — হয় ফ্যাসিজম, নয় কম্যুনিজম। আমি কম্যুনিজম-এর দিকে। আমাকে নির্বাচনের ভার দিলে আমি তাকেই বরণ করে নেব। ফ্যাসিজম আর কম্যুনিজম ছাড়া বিশ্বের সামনে নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।' .... সুভাষচন্দ্র সে কথা শুনে তাঁর ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল-এ লিখেছিলেন 'The view expressed here is, according to the author, fundamentally wrong. Unless we are at the end of evolution, or unless we deny evolution altogether, there is no reason to hold that our choice is restricted to two alternatives ..... Considering everything, one is inclined to hold that the next phase in world history will produce a synthesis between Fascism and Communism. And will it be a surprise if the synthesis is produced in India ?'

এবার আর বোকার মতো বলিনি এতটা মুখস্ত রেখেছেন 'ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল' থেকে? উনি একই ভঙ্গিতে বললেন—বুঝে দেখ নারায়ণ, সুভাষচন্দ্র যখন একথা লিখেছিলেন,

তখনো কিন্তু গুরুদেব লেখেননি 'আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে।'

কে একজন, সম্ভবত দেবুদাই, জানতে চাইলেন, সবটা মিলিয়ে কী বলতে চাইছেন? চারণকবি বিজয়লাল দৃঢ়স্বরে বলেছিলেন—আমি বলতে চাইছি, এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, স্বাধীনতা সংগ্রামে যদি নেতাজি শহিদ হয়ে যান, তাহলে ভারত ভাগ্যবিধাতা হবেন পণ্ডিতজি, এবং সে ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ হবে রাশিয়ার সগোত্র একটি কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র। আর যদি উল্টোটা হয় — যদি সুভাষচন্দ্র যুদ্ধান্তে ফিরে এসে ভারতবর্ষকে গড়ে তোলার সুযোগ পান — তাহলে আমরা দেখব কামাল পাশা আর লেনিনের এক synthesis ! দুটোর যেটাই হোক এই শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই ভারতবর্ষে পুঁজিপতিদের ধ্বংস অনিবার্য !

★ ★ ★

একবিংশ শতাব্দীর উষালগ্নে দাঁড়িয়ে নেতাজিকে শ্রদ্ধার্ঘ জানাতে বসে মনে পড়ছে পাঁচ-ছয় দশক আগেকার জীবনটার কথা। কী ভেবেছিলাম, আর কী হয়ে গেল! নেতাজি আদৌ ফিরে এলেন না। ছয় দশক আগে যে ভদ্রলোক বলেছিলেন যে, পৃথিবীর সামনে আজ দুটিমাত্র খোলা পথ — ফ্যাসিজম অথবা কম্যুনিজম, তিনিই বেছে নেবার সুযোগ পেলেন। কীভাবে গড়লেন স্বাধীন ভারতকে তা আপনাদের নতুন করে বলা নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু আমি প্রসঙ্গান্তরে চলে এসেছি। আমাদের আলোচ্য বিষয় ছিল : মুক্তি-সংগ্রামে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীদের পদ্ধতি আর লক্ষ্য। গান্ধীজির লক্ষ্যটা হয়তো পূর্ণ স্বরাজই ছিল, অন্তত বিভক্ত ভারত তিনি কল্পনাই করেননি। কিন্তু তেত্রিশ বছর ধরে তিনি 'অহিংস-পন্থায়' ছিলেন অটল। সুভাষচন্দ্রের পরামর্শে তিনি কোনকালেই কর্ণপাত করেননি।

আবার জানাই আমার ব্যক্তিগত ধারণার কথা। আপনারা মানতে পারেন, নাও মানতে পারেন। আগস্ট আন্দোলনের ক্রান্তিকালে গান্ধীজি অন্তরের গভীরে সুভাষপন্থা মেনে নিয়েছিলেন। তা না হলে তাঁর 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' নীতির ব্যাখ্যা হয় না। অহিংস সংগ্রামে 'করা'-র কোনো ভূমিকা নেই। অপ্রতিরোধে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাওয়াকে 'করা' বলে না, 'না-করা' বলে। কস্তুরবাঈ গান্ধীর পরলোকগমনের পর মহাত্মাজি যখন মুক্ত হলেন তখন সাংবাদিকেরা — বিশেষ করে ইংরেজি দৈনিকের সাংবাদিকেরা তাঁকে ওই প্রশ্নটি পেশ করেছিল—'করেঙ্গে' বলতে আপনি কোন কর্মসূচীর কথা তখন ভেবেছিলেন? অহিংস অসহযোগ?

গান্ধীজি জবাবে বলেছিলেন—আজ এ প্রশ্ন নিরর্থক। তখন সুযোগ পেলে আমি দেশবাসীকে বুঝিয়ে বলতাম, কী ছিল আমার কর্মসূচি — 'কুইট-ইন্ডিয়া'র প্রয়োগ বিধি। কিন্তু আমাকে তো তখন বলতে দেওয়া হয়নি।

সাংবাদিকেরা পুনরায় জানতে চেয়েছিলেন—কিন্তু ওই সব পুলিস-চৌকি ও থানা আক্রমণ করা, টেলিগ্রাফের লাইন উপড়ে ফেলা, রেল-লাইনের ফিশ-প্লেট খুলে নেওয়ায় কি আপনার সমর্থন ছিল ?

ব্যারিস্টার এম. কে. গান্ধী জবাবে বলেছিলেন—The questions are irrelevant, immaterial and absurd, because of the time factor. [প্রশ্নটা অপ্রাসঙ্গিক, অবাস্তব এবং অবান্তর, হেতুটা : সময়ের ব্যবধান।] তাছাড়া আমাকে এবং আমার নীতিনির্ধারক বন্ধুদের বলপূর্বক কারারুদ্ধ করায় দেশবাসী যা ভাল বুঝেছে তাই করেছে। I don't like to take up the post-mortem [আমি সেই শব-ব্যবচ্ছেদে আপনাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অস্বীকৃত।] [The Statesman]

গান্ধীজির মুখে এই জাতীয় কথা ইতিপূর্বে কখনো শোনা যায়নি।

গোপীনাথ সাহার প্রতি সমবেদনা প্রস্তাব এই গান্ধীজির আপত্তিতেই গ্রহণ করা যায়নি। অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত কোনো শহিদকে গান্ধীজি ইতিপূর্বে স্বীকারই করেননি — সম্মান জানানোর তো প্রশ্নই ওঠে না।

★ ★ ★

তাইহকু বিমান-দুর্ঘটনায় নেতাজির তথাকথিত মৃত্যুর সংবাদ প্রথম প্রকাশিত হয় জাপানী পত্রিকায় ২৩.৮.১৯৪৫ তারিখে। পরদিন আনন্দবাজারের খবর, "পুনা ২৪.৮.১৯৪৫ — ডঃ দীন শাহ্ মেহ্তার আরোগ্যভবনের উপর অদ্য ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখার যে প্রস্তাব হইয়াছিল, সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু-সংবাদ সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ থাকায় তাহা অগ্রাহ্য করা হয়। বর্তমানে মহাত্মা গান্ধী ও সর্দার প্যাটেল ওই ক্লিনিকে অবস্থান করিতেছেন।"

এই প্রসঙ্গে কিছু পূর্বকথা স্মরণ করা যেতে পারে। ২৮.৩.১৯৪২ তারিখ ইঙ্গ-মার্কিন সংবাদসূত্র থেকে প্রচার করা হয় যে, সুভাষচন্দ্র জাপানের উপকূলে একটি বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন। সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র সেবার মহাত্মাজি কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মৌলানা আজাদের সঙ্গে যৌথভাবে সুভাষজননী প্রভাবতী দেবীকে একটি শোকবার্তা পাঠান: "আপনার বীর সন্তানের প্রয়াণে সমগ্র জাতি আজ আপনারই ন্যায় শোকাতুর। ভগবান আপনাকে এই ক্ষতির বেদনা সহ্য করিবার শক্তি দিন" (আনন্দবাজার, ২৯.৩.১৯৪২)।

(ইতিপূর্বে বর্ণিত লুই ফিশারের প্রশ্নটি এই তারবার্তা প্রসঙ্গে। আগস্ট ১৯৪৫-এ গান্ধীজির পক্ষে কোনো তারবার্তা প্রভাবতী দেবীকে প্রেরণের প্রশ্নই ওঠে না; কারণ সুভাষজননীর প্রয়াণ দিবস : ২৮.১২.১৯৪৩)

ইঙ্গ-মার্কিন সংবাদসূত্র থেকে প্রচারিত সংবাদটি যে মিথ্যা তা অচিরেই প্রমাণিত হল বেতারে সুভাষের কণ্ঠস্বরে। মহাত্মাজী ও আজাদ তখন যুক্তভাবে সুভাষজননীর কাছে পুনরায় একটি তারবার্তা পাঠান : ''ঈশ্বরের অশেষ করুণা — যাহা সত্য বলিয়া প্রচারিত হইয়াছিল তাহা মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে। আমরা এবং সেই সঙ্গে সমগ্র জাতি আপনাকে অভিনন্দিত করিতেছি।''(আনন্দবাজার, ৩১.৩.১৯৪২)

এবার এই ১৯৪৫ সালে গান্ধীজি সংবাদটি আদৌ বিশ্বাস করেননি। প্রভাবতী দেবী অবর্তমান, কিন্তু দীর্ঘদিনের কংগ্রেস নেতা সুভাষাগ্রজ শরৎচন্দ্র এলগিন রোডের বাসায় বহাল তবিয়তে বর্তমান ছিলেন। সংবাদটা বিশ্বাস করলে গান্ধীজি নিশ্চয় তাঁকে শোকবার্তা পাঠাতেন। তা পাঠাননি। কারণ গান্ধীজি বুঝতে পেরেছিলেন কীভাবে ওই সংবাদটা সৃষ্ট হয়েছে। জাপান দু-তিন দিনের মধ্যেই আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছে। তাই নেতাজি নিজেই এই বিমান দুর্ঘটনার মিথ্যা রটনা করে পুনরায় আত্মগোপন করেছেন। সম্ভবত রাশিয়ায় চলে গেছেন। জাপান সরকারকে কৈফিয়তের বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি দিতেই সুভাষ স্বয়ং এই মিথ্যা রটনা জাপানী-কাগজে প্রচারের ব্যবস্থা করেন !

গান্ধীজি তো বিশ্বাস না করে নীরব রইলেন; কিন্তু কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট আবুল কালাম-এর মনে হল একটা স্টেটমেন্ট দেওয়া দরকার—বিশেষত তিন-দিনের ভিতরেও যখন নেতাজির মৃত্যু-সংবাদের কোনো প্রতিবাদ কোনো কাগজে ছাপা হল না। লক্ষণীয়, এবার কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট — যিনি ইতিপূর্বের মিথ্যা-মৃত্যু সংবাদ পেয়ে মহাত্মাজির সঙ্গে যৌথভাবে প্রভাবতী দেবীকে দু-দু'বার তারবার্তা পাঠান, এবার তিনি এ বিষয়ে গান্ধীজির সঙ্গে কোনো আলোচনা করার প্রয়োজন অনুভব করলেন না। 'নট-আ-ফোরঅ্যানা-মেম্বার' কংগ্রেস থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছেন। তাঁর প্রয়োজন ক্রমশ ফুরিয়ে আসছে। আজাদ স্টেটমেন্ট দিলেন কাগজে, ''প্রবাসে যে শোচনীয় অবস্থায় শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ভারতবাসী মাত্রই শোকসন্তপ্ত হইবে। ... তাঁহার স্বদেশপ্রেম সন্দেহের অতীত। একটা সঙ্কটের সময় ভ্রান্তপথে পদক্ষেপ না করিলে আজ তিনি আমাদের মধ্যে থাকিতেন।'' (আনন্দবাজার, ২৭.৮.১৯৪৫)

একটা লোক ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধ করতে গিয়ে প্রাণ দিল, তবু তার শোকবার্তায় 'ভ্রান্ত পদক্ষেপ'-এর উল্লেখ না করে স্বস্তি পেলেন না আবুল কালাম আজাদ ! আর দুঃখটা কেন? ওই 'ভুল'টা না করলে 'তিনি আজ আমাদের মধ্যে থাকিতেন!'—

সেই নন্দলালের জীবনদর্শন : অভাগা দেশের কী হবে তাহলে আমি যদি মারা যাই। তবু আবুল কালাম অসহ্য নন। সহ্যের সীমা অতিক্রম করল জওহারলালের বাচালতায়, "সুভাষবাবুর মৃত্যু-সংবাদ আমাকে মর্মাহত করিয়াছে। কিন্তু ইহা আমাকে স্বস্তিও দিয়াছে। তিনি ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে জীবন বিসর্জন দিলেন। তাঁহার ন্যায় সাহসী সৈনিকের ভাগ্যে অনেক সময় যে দুঃখ-দুর্দশা নিহিত থাকে, তিনি যে তাহা হইতে মুক্তি পাইয়াছেন ইহাতেই আমার স্বস্তি। ... অনেক বিষয়ে আমাদের ব্যক্তিগত মতভেদ ছিল। তিনি আমাদিগকে ছাড়িয়া পৃথক ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন করিয়াছিলেন। কিন্তু আজীবন দেশের স্বাধীনতার জন্য তিনি যে সংগ্রাম করিয়াছেন এ সম্পর্কে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না।" [এটোয়াবাদে জওহারলালের বক্তৃতা থেকে উদ্ধৃত, আনন্দবাজার ৩০.৮.১৯৪৫]

লক্ষ্য করে দেখছি, শোকবার্তায় মর্মাহত হওয়ার কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে জওহারলাল প্রায় এক নিশ্বাসে বলেছেন, "ইহা আমাকে স্বস্তিও দিয়াছে !" নেহরুজি বক্তৃতাকালে বড় বাচালতা করতেন; ফলে বেফাঁস উক্তিও করতেন। পরবর্তী বক্তব্যে ত্রুটিটা শুধরে নেবার চেষ্টাও করতে হত। এ ক্ষেত্রেও বেমক্কা বলে ফেলা ওই 'স্বস্তি পাওয়ার' কৈফিয়ৎ দিয়ে নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টাও করেছেন। ধরে নেওয়া যাক, তাঁর ব্যাখ্যাটাই সত্য। কিন্তু সেকথার অর্থ কী ? মৃত্যু না হলে কী হত ? নেতাজি আত্মসমর্পণ করতেন। যেমন করেছেন অনেক জার্মান ও জাপানী সেনাপতি। সেক্ষেত্রে হয়তো ব্রিটিশ সরকার (যদি সে সময় তাদের হিম্মতে কুলাতো) সামরিক বিচারসভায় রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে তাঁকে দাঁড় করাত। তারপর ? তাঁতিয়া তোপীর (যাঁর নাম ডিসকভারি অব ইন্ডিয়ায় নেই) মতো নেতাজির মৃত্যুদণ্ড হত। তারপর ? ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, গোপীনাথ, কীর্তি আজাদ, ভগৎ সিং প্রভৃতির মতো নেতাজির ফাঁসি হত। 'সো হোয়াট' ? ফাঁসির দড়িতে অথবা ফায়ারিং স্কোয়াডের গুলিতে নেতাজির মৃত্যু হবার পরিবর্তে মাসকয়েক আগে বিমান-দুর্ঘটনায় মৃত্যু হওয়ায় পণ্ডিতজি 'স্বস্তি' পাচ্ছেন কোন যুক্তিতে ? ফাঁসির দড়িতে মৃত্যুর সম্ভাবনার কথা জেনেবুঝেই তো সুভাষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান শত্রু হবার চাকরিটা গ্রহণ করেছিলেন। এটাকে অসম্মানজনক মনে করলে সুভাষচন্দ্র তো অনায়াসে আই. সি. এস. চাকরিটা গ্রহণ করতেন। কাঠগড়ার পরিবর্তে বিচারকের আসনে বসে রাজদ্রোহীদের ফাঁসির হুকুম মঞ্জুর করতেন! জওহারলালদের ফার্স্ট ক্লাস প্রিজনার বানাতেন।

বাঙলায় একটা কথা আছে : মরার বাড়া গাল নেই। —

মৃত্যু, বিমান-দুর্ঘটনায় হোক অথবা ফাঁসির রজ্জুতে — দুইই তো সমান।

তাহলে পণ্ডিতজির ওই পাণ্ডিত্যপূর্ণ 'স্বস্তিবোধে'র মূল উৎসটা কী ? সবচেয়ে উদার ব্যাখ্যায় বলা যায় — দক্ষিণপন্থী নেতারা, বিশেষ করে জওহারলাল, বক্তৃতামঞ্চে

দেশাত্মবোধের কথা বলা, প্রয়োজনে ফার্স্টক্লাস কয়েদি হিসেবে কারাবরণ, যষ্টিবর্ষণের সময় মাথা বাঁচানোটাকেই দেশপ্রেমের চরম বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করতেন — 'দেশের জন্য প্রাণদান' বলতে ঠিক কী বোঝায় তা জানতেন না, বা বুঝতেন না। হয়তো সেজন্যই ক্ষুদিরাম থেকে নেতাজি এবং তাঁর আজাদ হিন্দ বাহিনী ছিল ওঁদের দক্ষিণপন্থী বিচারে : ভ্রান্ত পথিক!

এই ব্যাখ্যাটা না মেনে নিলে জওহারলালের স্বমুখে স্বীকৃত ওই কথাটা — 'স্বস্তি পাওয়া'র যে ব্যাখ্যাটা অনিবার্য হয়ে পড়ে সেটা ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে আরও অপমানজনক!

জওহারলালের কথা থাক। গান্ধীজির কথা বলি। সুভাষচন্দ্র আর গান্ধীজি দুজনেই ছিলেন মহামানব। সত্যাশ্রয়ী, দেশপ্রেমিক, কষ্টসহিষ্ণু, স্বাধীনতা-সংগ্রামের নির্ভীক একনিষ্ঠ সৈনিক। তাহলেও জীবনাদর্শে দুজনের যথেষ্ট পার্থক্যও ছিল। ভারতীয় সংস্কৃতিতে যাঁর অবদান অত্যুচ্চ মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত সেই যুগাবতার গৌতম বুদ্ধের দু-দুটি গুণ ওঁদের দুজনের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছিল। গান্ধীজি গ্রহণ করেছিলেন বুদ্ধদেবের বাণী : অহিংসা পরম ধর্ম; অপরপক্ষে সুভাষচন্দ্র অবলম্বন করেছিলেন গৌতমবুদ্ধের শেষ উপদেশটি :

কুশীনগরে অশীতিপর বুদ্ধদেব যখন শেষ শয়ানে দুটি শালবৃক্ষের মাঝখানে শায়িত তখন তাঁর সহস্রাধিক শিষ্যবর্গের মধ্যে মাত্র একজন উপস্থিত ছিলেন তাঁর পদপ্রান্তে : মহাভিক্ষু আনন্দ। তিনি বুদ্ধদেবকে প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি এখন মহাপরিনির্বাণের পথে অভিযাত্রী, ফলে আমাদের বলে যান : ধর্মাকরণের বিষয়ে মনে কোনও সংশয় জাগলে আমরা অতঃপর কার কাছে পরামর্শ চাইতে যাব?

হয়তো মহাভিক্ষু আনন্দ জানতে চেয়েছিলেন বুদ্ধদেবের প্রয়াণের পর কে হবেন সঙ্ঘের পরিচালক। কিন্তু বুদ্ধদেব প্রশ্নটিকে সেই অর্থে গ্রহণ না করে বলেছিলেন : আত্মদীপো ভব। আত্মশরণো ভব।। অনন্যশরণো ভব।।।

অর্থাৎ নিজেকে প্রদীপ করে জ্বালাও। সেই আত্মদহনকারী দীপালোকে জীবনের পথ চলবে। অন্যের কথায় কান দেবে না।

এটাই যে সুভাষচন্দ্রের জীবনের মন্ত্র ছিল তা আমরা বারে বারে দেখেছি। বাল্যে মাতাপিতাকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করতেন তিনি— ভূমের্গরীয়সী মাতা, স্বর্গাদুচ্চতরো পিতা। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। কিন্তু কটক শহরে বিসূচিকারোগীদের সেবা করতে যাবার অনুমতি দিতে অভিভাবকেরা যখন ইতস্তত করলেন তখন তাঁর মন ঘুরে গেল। শিক্ষক বেণীমাধবকে গুরু করলেন। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর মোহভঙ্গ হল। তখন তিনি বিবেকানন্দের রচনাবলী পাঠ করতে বসলেন। রাজনীতির মঞ্চে

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে বরণ করলেন গুরুর পদে; আর দার্শনিক বিচারে শিষ্যত্ব নিলেন স্বামী বিবেকানন্দের। এভাবে জীবনে বহুবার তিনি আদর্শকে পরিবর্তন করেছেন বিবেকের নির্দেশে। আই. সি. এস. চাকরি ত্যাগ করে এসে খাটো খদ্দরের ধুতি পরা গান্ধীজিকে আশ্রমে চরকা কাটতে দেখে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। তাঁরই নির্দেশে পেলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে। যোগ দিলেন গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনে। কিন্তু গান্ধীজি যখন চৌরিচৌরার আঞ্চলিক দুর্ঘটনায় সর্বভারতীয় আন্দোলন স্থগিত রাখার ফতোয়া জানালেন, মৃত্যুঞ্জয়ী দেশসেবক শহিদ গোপীনাথ সাহার বীরত্বকে অস্বীকার করলেন, তখন সুভাষ মনে মনে ত্যাগ করলেন গান্ধীজির আদর্শ। সুভাষের লক্ষ্য ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা। এদিকে গান্ধীজি তখন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় অবিসংবাদিত কর্ণধার। দীর্ঘদিন ধরে উচ্চ ও মধ্যবিত্তের সঙ্কীর্ণ শহুরে স্বাধীনতা-সংগ্রামকে গান্ধীজি গ্রাম-গ্রামান্তরে বিস্তারিত করে দিয়েছেন — একথা অনস্বীকার্য। তাই গান্ধীজির আদর্শ পুরোপুরি না মানলেও তাঁর নেতৃত্বকে স্বীকার করে নিতে হল। তিলতিল করে দক্ষিণপন্থী নেতাদের মধ্যে যাঁরা সাচ্চা দেশপ্রেমিক তাঁদের বামনীতির দিকে আকর্ষণ করতে থাকেন। এ প্রচেষ্টার পূর্ণচ্ছেদ হল ত্রিপুরী কংগ্রেসে ভোটে জয়লাভ করে। গান্ধীজির আশীর্বাদধন্য পট্টভির মতো অখ্যাত নেতাকে পরাজিত করে।

গান্ধীজির চরিত্র বিশ্লেষণ করলে মনে হয় স্বরাজলাভের স্বপ্নের চেয়েও তাঁর কাছে বড় ছিল অহিংসা-নীতি। 'এন্ডস' নয়, 'মিনস্'ই তাঁর কাছে বড়। অপরপক্ষে সুভাষের কাছে সবচেয়ে বড় ছিল তাঁর বিবেকের নির্দেশ! সে বিবেকনির্দেশে বারে বারে দিক পরিবর্তন করেছে, কিন্তু ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্গে সে বিবেকনির্দেশ এমন ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত ছিল যে, এই দুইয়ের মধ্যে কোনটা তাঁর কাছে বড় তা নির্ধারিত হয়নি। পিছন ফিরে দেখতে গিয়ে মনে হচ্ছে 'ভারতের স্বাধীনতা লাভ', 'ব্রিটিশ শৃঙ্খলমুক্ত ভারত' সুভাষের শেষ স্বপ্ন ছিল না। তাঁর লক্ষ্য ছিল আরও সুদূর প্রসারিত। তিনি ইয়োরোপ ও পশ্চিমদেশগুলির সামন্ততান্ত্রিক আগ্রাসীনীতি থেকে গোটা এশিয়ার — শুধু ভারতের নয় — মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন। তাঁর চরিত্রের এবং কর্মের এই দিকটা আমরা সচরাচর খেয়াল করি না।

এই ভাবধারার গঙ্গোত্রীর সন্ধান পাওয়া যাবে অতি-অতীতকালে — ১৯২২ সালের গয়া কংগ্রেসে। সেবার গয়া কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। তাঁর ভাষণে দেশবন্ধু বলেছিলেন — 'A full and unfettered growth of nationalism of entire Asia is necessary.... Even more important is participation of India in the great Asiatic federation. [সমগ্র এশিয়ায় জাতীয়তাবাদের সম্পূর্ণ এবং বাধাহীন বিকাশ আজ অত্যাবশ্যক ... কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা এশিয়ার জাতি-সমবায়ের উদ্যোগে ভারতের অংশগ্রহণ।] সেদিন থেকেই

পশ্চিমের আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গোটা এশিয়ার মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন সুভাষ।

দেশবন্ধুই তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন স্বাধীনতা-সংগ্রামে জয়ী হতে হলে শুধু অসহযোগ, মিটিং-মিছিলে কাজ হবে না, গড়ে তুলতে হবে সশস্ত্র সেনাবাহিনী। লোকবলে গোটা এশিয়া গরীয়ান। প্রয়োজন সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া, অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করা। এইজাতীয় চিন্তাই ছিল পূর্ববর্তী দশকে রাসবিহারী ও বাঘাযতীনের। গান্ধীপন্থীদের সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় এই গয়া কংগ্রেসেই দেশবন্ধু সৃষ্টি করেন স্বরাজ্যদল। এই স্বরাজ্যদলের প্রচার-মানসে দেশবন্ধু মাদ্রাজ শহরে গিয়ে গোপনে গড়ে তুলেছিলে কিছু বিপ্লবী নেতার সাহচর্যে এক সঙ্গোপন সশস্ত্র দল — যাকে বলা যায় 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি'র বীজবপন। সেই সময় সাম্যবাদের জনক লেনিনের সঙ্গেও তিনি যোগাযোগ করেন।

১৯২২ সালে চতুর্থ আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য সুভাষচন্দ্র এবং দেশবন্ধুর পুত্র চিররঞ্জন দাশ লেনিনের আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। দেশবন্ধুর সঙ্গে লেনিনের যোগসূত্রের মাধ্যম ছিলেন মাদাম ভিখাজি কামা। কামা ছিলেন মুম্বাইয়ের মেয়ে। তিনি কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনে আস্থা হারিয়ে সশস্ত্র বিপ্লবের পথে চলতে চেয়েছিলেন। দেশে থেকে কাজ করা যাবে না দেখে তিনি ১৯০২ সালে লন্ডন চলে যান। লন্ডনে যে ছাত্ররা যেত তাদের তিনি বিপ্লবের পথে টেনে নিতেন। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে ব্রিটেন থেকে তাড়াতে চায় বুঝতে পেরে তিনি ১৯০৯ সালে প্যারিসে চলে যান। তিনি ত্রিশ বছর প্যারিসে বাস করেছিলেন। ভারতীয় বিপ্লবীরা তাঁর কাছে আসতেন। রাশিয়াসহ ইউরোপের বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। লেনিন ছিলেন তাঁদের অন্যতম সহায়ক।

'মাদাম কামা যখন লন্ডনে ও প্যারিসে ছিলেন, তখন লেনিনও ওই দুই শহরে কাটিয়েছেন। বিপ্লবের চিন্তা ও কর্মসূত্রেই দুজনের মধ্যেই নিবিড় যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। ১৯০৭ সালের আগস্টে জার্মানীর স্টুটগার্ট শহরে আন্তর্জাতিক সোসালিস্টদের প্রথম সম্মেলন বসেছিল। লেনিন তাতে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি এসেছিলেন বলশেভিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়ে। ওই সম্মেলনে উপনিবেশগুলির স্বাধীনতার প্রশ্নে অন্যান্য মার্কসবাদীদের বিরুদ্ধে লেনিনকে লড়তে হয়েছিল। জার্মান কম্যুনিস্ট নেতা বার্নস্টাইনসহ ইউরোপের অন্যান্য কমিউনিস্ট নেতাদের মত ছিল, উপনিবেশগুলিকে পরাধীন করে রাখাই প্রয়োজন। কেননা তাহলে তারা সভ্যতা শিখবে। সম্মেলনে এই মর্মে প্রস্তাবও পেশ করা হয়েছিল। লেনিন এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করে বলেছিলেন—এ হল প্রোলিতারিয়েতকে বুর্জোয়া ইডিওলজি ও বুর্জোয়া সাম্রাজ্যবাদের অধীন করে রাখার ব্যবস্থা।

"স্টুটগার্টে এই সম্মেলনে লেনিনের সমর্থনে ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত স্বাধীনতার পতাকা তুলেছিলেন মাদাম কামা। তবে বর্তমান গৈরিকের বদলে সেই স্থানে ছিল লাল রঙ, আর পতাকার কেন্দ্রস্থলে চরকা বা চক্রের পরিবর্তে লেখা ছিল 'বন্দেমাতরম্'।"

(বিশ্বযুদ্ধের পর নেতাজি, পবিত্রকুমার ঘোষ, বর্তমান)

এতকথা বলছি বোঝাতে যে, যদিও দেশবন্ধু ও সুভাষ কেউই কমিউনিস্ট হননি, কিন্তু ১৯২১-২২ সাল থেকেই রাশিয়ার সাম্যবাদী সরকারের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ১৯৩৩-৩৬ সালে সুভাষ যখন ইউরোপে ছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে বৃদ্ধা মাদাম কামার যোগাযোগ ঘটেছিল। সেই যুগ থেকেই সুভাষের অন্তরে ওই সিদ্ধান্তটা দৃঢ়মূল হয়ে ওঠে : ভারত ও এশিয়ার মুক্তিযুদ্ধ অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। ১৯৪১-এ তাঁর মহানিষ্ক্রমণ সেই চিন্তাধারারই ফলশ্রুতি। বর্মা রণাঙ্গনে তাঁর আজাদ-হিন্দ বাহিনীর মরণপণ সংগ্রাম সেই স্বপ্নের বাস্তবায়ন।

তিন

ভারত আজ স্বাধীন — সার্বভৌম রাষ্ট্র।

যাঁরা বলেন 'এ আজাদি ঝুটা হ্যয়' আমরা তাঁদের দলে নই। এ আজাদি হরগিজ সাচ্চাই! শতসহস্র শহিদের শোণিতস্নাত এই ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা, এই 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র আর 'জয়হিন্দ' পুকার, এই 'জনগণমন' জাতীয় সঙ্গীত অথবা অশোকচক্রের অসম্মান আমরা হতে দেব না। মানছি, একদল অপশাসক আমাদের গলায় পা দিয়ে লুঠেপুটে খাচ্ছে। হাওলা-গাওলা-বোফর্স-ওয়াকফ কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়া ওই অপশাসকদের আমরা এখনো কব্জা করতে পারছি না। পুলিশ অপশাসক দলের সহায়ক। প্রশাসন তাদের কব্জায়, আইনের দীর্ঘসূত্রতায় তারা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। মায় মিডিয়ার একাংশ সেই অপশাসকদের বশংবদ। তবু স্বাধীনতাকে অস্বীকার করবেন কীভাবে? আজাদী যদি ঝুটা হয় তাহলে আমরা কীভাবে লাভ করেছি এইসব দুর্লভ সম্পদ?

(এক) ভারতীয় সংবিধান। সমাজতন্ত্র। স্বাধীন ভারতের অপশাসকেরা হিটলার, মুসোলিনী, স্ট্যালিন বা ইদি আমিনের কায়দায় প্রতিবাদী কণ্ঠকে গলা টিপে মেরে ফেলতে পারছে না। কেন? মানছি, সফদার হাসমি বা শঙ্কর গুহনিয়োগীর মতো সাচ্চা নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমীকে চোরাগোপ্তা খুন করা হচ্ছে, কিন্তু এটাও আমরা দেখেছি যে, কোনো স্বাধিকারপ্রমত্ত প্রধানমন্ত্রী সংবিধানের মাথায় পয়জার মারতে চাইলে জনগণের প্রচণ্ড কৌতুকে তাঁকে ভূলুণ্ঠিত হতে হয়। জয়প্রকাশ থেকে গৌর ঘোষকে

জেলে ঢুকিয়ে দিয়ে সে দুর্দৈবকে ঠেকাতে পারেননি দিল্লীশ্বরী। এটা বিশ্বত্রাস হিটলারের জার্মানী, একনায়কতন্ত্রী মুসোলিনী, অথবা লৌহমানব কমরেড স্ট্যালিনের রাশিয়ায় সম্ভবপর ছিল না।

(দুই) আমাদের আছে বাক্-স্বাধীনতা। গোটা তৃতীয় বিশ্বে আর কোথায় আছে মতপ্রকাশের এ জাতীয় ব্যক্তি-স্বাধীনতা? সত্য কথা বলার অপরাধে তসলিমা নাসরিনের মতো আপনাকে-আমাকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হয় না।

(তিন) স্বাধীনতা-উত্তরকালে ভারতবাসী সাধারণভাবে অসাম্প্রদায়িক। সৎ, ধর্মপরায়ণ, শান্তিকামী এবং পরধর্মসহিষ্ণু। যদিও রাজনৈতিক স্বার্থে গেরুয়া-সবুজ দল ভেদনীতি জিইয়ে রাখতে বদ্ধপরিকর, তবু হাজারে ন'শ নিরানব্বইটি গ্রামে শহরে পাশাপাশি মহল্লায় ভিন্নধর্মীরা একে অপরের বন্ধু। ধর্মের বিচারে সংখ্যালঘুরা আমাদের প্রতিবেশী কোন সার্বভৌম রাষ্ট্রে এত নিরাপদ ?

(চার) দেশের বিজ্ঞানসাধকেরা — ডাক্তার, এঞ্জিনিয়ার, রসায়ন ও পর্দার্থবিদ্যার পণ্ডিত ও প্রযুক্তিবিদেরা ভারতকে একটি প্রগতিশীল প্রথম সারির রাষ্ট্রে উন্নীত করেছেন। রাজনীতি-ব্যবসায়ীদের ছলচাতুরিতে সেসব আবিষ্কারের সুফল হয়তো জনতার তৃণমূলে পৌঁছতে পারছে না। একদিকে শিল্পপতি অপরদিকে তাঁদের স্নেহধন্য অসাধু বিধায়ক, সাংসদ, সিকিমন্ত্রী, আধামন্ত্রী, পুরমন্ত্রী, বুড়োমন্ত্রী অথবা তাঁদের পুত্রকলত্র বা দামাদেরা মাঝপথে সবকিছু লুটেপুটে খাচ্ছে। কিন্তু সেজন্য বিজ্ঞানসাধকেরা নিশ্চয় দায়ী নন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই সাফল্য নিশ্চয় স্বাধীনতার ফলশ্রুতি।

(পাঁচ) খাদ্য বিষয়ে ভারত আজ স্বয়ম্ভর। সবুজ-বিপ্লব সার্থক। ইংরেজ আমলে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে, অথবা আমাদের স্বচক্ষে দেখা তেতাল্লিশের মন্বন্তরে আজ আমরা মরি না। স্বীকার্য, জনতার এক বিরাট অংশ আজও দারিদ্র্যসীমার নীচে, কিন্তু জনস্ফীতি সত্ত্বেও গ্রামে ও শহরে ভিখারির সংখ্যা সর্বত্র কম। কালীঘাটের মন্দির, নাখোদা মস্‌জিদ অঞ্চল ছাড়া কলকাতায় ভিক্ষাজীবীর দর্শন পাওয়া ভার। অতি সম্প্রতি বাংলাদেশের কয়েকটি বড় বড় শহর ঘুরে দেখে এসে এই সত্যটা নতুন করে অনুভব করলাম।

(ছয়) স্বাধীনতাউত্তর কালে বেতনভোগী সেনাবাহিনীর উত্তরণ ঘটেছে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ প্রতিরক্ষা বাহিনীতে। তৃতীয় বিশ্বে এখানে-ওখানে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে একটা দৈত্য : 'ক্যু'! আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনীর অতন্দ্র প্রহরায় পাঁচ-দশকের ভিতর সে ভারতে একবারও মাথা তুলতে পারেনি। সাম্প্রতিক কার্গিল যুদ্ধে হিন্দু-মুসলমান-শিখ-খ্রিস্টান প্রভৃতি কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে অপরিসীম কৃতিত্ব দেখিয়েছে।

(সাত) গদি-আসীন ও গদি-লোভীদের কথা বলছি না। মাল্যভূষিত অমুক ষড়যন্ত্রীমশাই শিলান্যাস করছেন— ক্লিক - ক্লিক, অথবা দ্বারোদঘাটন—ফ্ল্যাশ-ফ্ল্যাশ! দূরদর্শন এবং অধিকাংশ সংবাদ মিডিয়া তাঁদের গুণকীর্তনেই বিভোর। এইসব প্রচারকামী

ভোটভিক্ষু ব্যতিরেকেও দেশের সেবা করে চলেছেন অনেকে। তাঁরা রাজনীতি থেকে শত হস্ত দূরে। রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, রেডক্রস, মানবাধিকার, হেল্প-এজ ইন্ডিয়া, এ. পি. ডি. আর., মাদার টেরেসার প্রতিষ্ঠান, বাবা আমতে, সুন্দরলাল বহুগুণা, মেধা পটেকর প্রভৃতিরা। এঁরা আমাদের সাহায্য চান। ভোট চান না। দূরদূরান্তরের সব খবর পাই না — কিছু কিছু সংবাদ পাই লিট্‌ল ম্যাগাজিনের মাধ্যমে। হাতের কাছে দেখতে পাচ্ছি: বীরনগরে গোপালদার ঊষাগ্রাম, কৃষ্ণনগরে দেবুবাবুর রামকৃষ্ণ পাঠাগার; ভদ্রেশ্বরে 'শেলটার' মানসিক ভারসাম্যহীনদের জন্য একটি অপূর্ব প্রতিষ্ঠান, আই-ব্যাঙ্কের একাধিক ক্লাব, মরণোত্তর দেহদানের প্রতিষ্ঠান, মৈত্রেয়ী দেবী প্রতিষ্ঠিত 'খেলাঘর'-এ পরিত্যক্ত শিশুরা জীবনে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। এঁরাই প্রাক্‌স্বাধীনতা যুগের নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমের ঐতিহ্য প্রদীপখানি প্রজ্জ্বলিত রেখেছেন। সচরাচর এঁরা প্রচার-মিডিয়ার প্রসাদ পান না। এবং পার্টি-পরিচালিত সরকারী অনুদান থেকে বঞ্চিত। তবু এঁদের সেবাকর্ম সম্ভবপর হয়েছে, প্রসারলাভ করেছে দেশটা স্বাধীন হবার পর !

এবার ব্যালেন্স-সিটের অপর অংশ — অর্থাৎ স্বাধীনতাউত্তরকালে কী পাইনি তার হিসেব মেলানো যেতে পারে। সেই তালিকাটিও দীর্ঘ এবং আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের সঙ্গে বস্তুত সম্পর্কবিমুক্ত। মহাত্মাজি ও নেতাজির আত্মদানে, শতশহিদের আত্মাহুতিতে যা পেয়েছি তার মূল্যায়ন করার একটা অর্থ হয়, যা পাইনি তার জন্য তাঁরা কেউই দায়ী নন। আবারও সেই একই কথা বলতে হয় — 'এ আমার এ তোমার পাপ !'

স্বাধীনতাউত্তর ভারতের সর্বপ্রধান ব্যর্থতা : জনসংখ্যার স্ফীতিরোধে শাসকদলের অসাফল্য। চীন ও ভারত প্রায় একই সময়ে স্বরাজলাভ করেছে। চীন তার জনসংখ্যার বৃদ্ধিকে রুখে দিতে পেরেছে, ভারত পারেনি। চীনের যা উন্নতি হচ্ছে তার সুফল লাভ করছে সে দেশের সুস্থিত মানবগোষ্ঠী। ভারতে যা উন্নতি হচ্ছে তা গলাধঃকরণ করছে জনস্ফীতি নামক বক রাক্ষস। এই ব্যর্থতা মূলত নেহরু-ডায়ন্যাস্টির তিন জেনারেশনের আত্মকেন্দ্রিকতা, কোনোক্রমে গদিতে টিকে থাকাকেই জীবনের চরম লক্ষ্য মনে করা !

দ্বিতীয় ব্যর্থতা : শিক্ষার অভাব। এই তো সেদিন অধ্যাপক অমর্ত্য সেন খোলাখুলি বললেন, "সারা পৃথিবীতে ভারত একমাত্র স্বাধীন রাষ্ট্র যে একবিংশ-শতাব্দীতে পদার্পণ করছে তার জনসংখ্যার আধাআধি আনপড়কে নিয়ে।" তিনি আরও বলেছেন, "প্রায় প্রতিটি রাজ্যসরকার প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রদর্শন করেছে incredible irresponsibility." আমাদের ভারাক্রান্ত মনে সিদ্ধান্তে আসতে হয়েছে শিক্ষার প্রতি শাসকবৃন্দের এই অনীহার দুটি হেতু। প্রথম কথা : প্রতিটি রাজ্য-সরকার চায় রাজনৈতিক দল হিসাবে রাজ্যটা শাসন ও শোষণ করতে। সেদিকেই তারা নিবদ্ধদৃষ্টি। দ্বিতীয়

কথা : প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করলে ভোটদাতাদের চোখ খুলে যাবে। নিজেদের এবং রাজ্যের ভালমন্দ বুঝতে শিখবে। জাতপাত, অন্ধ-কুসংস্কার, সাম্প্রদায়িকতার হাতিয়ার প্রয়োগে তখন ভোটদাতারা দাদাদের নির্দেশে ল্যাম্পপোস্টকে ভোট দিতে গড্ডলিকাপ্রবাহে সামিল হতে চাইবে না। নবীন যুগের পাঠকদের প্রসঙ্গত জানাই ওই বিচিত্র রূপকটি ''ল্যাম্পপোস্টকে ভোট দেওয়ার থিয়োরিটার'' প্রথম আবিষ্কারক ও প্রয়োগকারী স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহারলাল নেহরু। এই প্রসঙ্গে আরও স্মর্তব্য, সংবিধান প্রণয়নের সময় পঁয়তাল্লিশ নম্বর ধারায় বলা হয়েছিল যে, প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার দানের দশ বছরের মধ্যে প্রতিটি রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে করতে হবে বাধ্যতামূলক ও বিনামূল্যে। যা করা হয়নি।

স্বাধীন ভারতের তৃতীয় ভ্রান্তি তড়িঘড়ি প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার দান করা। সব দিক বিবেচনা করে বলা যায়, প্রাপ্তবয়স্কদের এই ব্যাপক ভোটাধিকার প্রদানে ভারতের যে ক্ষতিসাধন করা হয়েছে, গণতন্ত্রের ইতিহাসে পৃথিবীর অন্য কোথাও তা হয়নি, আর কোনও সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কথা তো স্মরণ করা যাচ্ছে না, যে দেশ স্বাধীনতা প্রাপ্তিমাত্র ভোটাধিকারের 'হরির লুট দিয়েছে'। তৃতীয় বিশ্বের প্রায় প্রতিটি সদ্যস্বাধীন রাষ্ট্র প্রথম পর্যায়ে শাসকদের নির্বাচন করেছিল সীমিত-শিক্ষিত দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মাধ্যমে। ক্রমে তারা প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের স্নাতক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। আমাদের স্বাধীনতার ঊষাযুগে তিন-তিনজন প্রাজ্ঞ সুপণ্ডিত জওহারলালকে বারণ করেছিলেন এই ভুল না করতে। তাঁরা হলেন, রাজাগোপালাচারী, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ। কিন্তু জওহারলালের নির্দেশে কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলির তদানীন্তন ল্যাম্পপোস্টের দল ওই তিনজন ভূয়োদর্শীয়র কথায় কর্ণপাত করলেন না। নেহরু এই আইন পাস করিয়ে নিলেন।

শাসকদলের চতুর্থ ভ্রান্তি একতাবোধ জাগ্রত করায় ব্যর্থতা।

আমেরিকান ফেডারেল স্টেটগুলির ভাষা, জীবনযাত্রার প্রণালী, লোকসংস্কৃতি, ধর্ম ও ধ্যান-ধারণার মধ্যে ততটা প্রভেদ নেই, যতটা আছে ভারতে। একটি রাজ্য ভেঙে দুটি করার প্রবণতা সেখানে নেই। কারণ গদিতে উঠে বসলেই সেখানে চুরি করার অধিকার বর্তায় না। সাদা-কালো সমস্যা ব্যতীত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বস্তুত আভ্যন্তরীণ আর কোনো সমস্যা নেই।

ভারতে গোষ্ঠীগত স্বার্থে ধর্ম-ভাষা-লোকসংস্কৃতির জিগির তুলে ক্রমাগত এক রাজ্য ভেঙে দুটি-তিনটি হয়েছে, হচ্ছে ও অদূর ভবিষ্যতে হবে। উদাহরণ : ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, তেলেঙ্গানা, বিদর্ভ, উত্তরখণ্ড, গোর্খাল্যান্ড, বোরোল্যান্ড। প্রত্যেকটির

জন্য এক-এক আঞ্চলিক নেতা খাড়া হয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার নতি স্বীকার করলেই তাঁরা নিজ নিজ এলাকায় মুখ্যমন্ত্রী হয়ে গদিতে চড়ে বসবেন, পুত্র-কলত্র, ভাই-ভাতিজাকে লোভনীয় পদে অধিষ্ঠিত করবেন।

ভাষাগত বা অন্যান্য বিভেদের চেয়ে ভারতে প্রধান সমস্যাটা হয়ে পড়েছে সাম্প্রদায়িকতা। পশ্চিম য়ুরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে, আমেরিকায় প্রায় সবাই খ্রিস্টান। মিশর, পাকিস্তান, সৌদি আরব, আফগানিস্তানে প্রায় সবাই মুসলিম। কিন্তু ভারতে একাধিক ধর্মের লোকের বাস—হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, শিখ, বৌদ্ধ, পার্শী, জৈন প্রভৃতি। এখানে সমস্যাটা অত্যন্ত তীব্র হয়ে পড়েছে হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে। হেতুটাও সহজবোধ্য। ধর্মের জিগির তুলে একজাতির রাজনীতিক বেনিয়া ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নিচ্ছে। ভোটের বাজারে মুনাফা লুটছে।

আমরা আজ যে দুজন মহামানবের মূল্যায়ন করতে বসেছি তাঁদের মধ্যে একজন — মহাত্মা গান্ধী এই সাম্প্রদায়িকতার বিষবহ্নিতেই জীবন বিসর্জন দিলেন। তাঁর জীবনের শেষ দুটি বছর তিনি এই একটিই লড়াই করেছেন — সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। আগস্ট ১৯৪৬ থেকে জানুয়ারি ১৯৪৮। এই সময়কালে তাঁর জপের মন্ত্র ছিল : 'ঈশ্বর আল্লাহ্ তেরে নাম, সবকো সন্মতি দে ভগবান।'

এখানেও দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হবে মহাত্মাজি ব্যর্থ আর সুভাষচন্দ্র সফল।

গান্ধীজির প্রথম সর্বভারতীয় আন্দোলন ছিল খিলাফৎ ও সত্যাগ্রহ। খিলাফতের বনিয়াদে ছিল অতীতমুখী সাম্প্রদায়িকতা। সত্যাগ্রহ আন্দোলনেও গান্ধীজি জোর দিতেন গীতার ওপর, রামরাজ্যের ওপর—যেটা পছন্দ হত না মুসলমান জনসাধারণের। কখনো কখনো মহাত্মাজি প্রকাশ্য সভায় গীতা, কুরান ও বাইবেল-এর শ্লোক একসঙ্গে উচ্চারণ করতেন। মুসলমানরা মনে করত সেটা গান্ধীজির ভণ্ডামি! সীমান্ত গান্ধী, আজাদ, আসফ আলী প্রভৃতি অনেক মুসলমান প্রভাবশালী, ধার্মিক ও দেশপ্রেমিক শিষ্য তিনি লাভ করেছিলেন বটে কিন্তু জালালউদ্দিন আকবরের মতো তিনিও 'দীন-ই-ইলাহি' ধর্মের প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

সুভাষচন্দ্রেরও ছিল প্রগাঢ় ধর্মচেতনা। তাঁর সেজদা সুরেশচন্দ্র লিখেছেন, এটা ছিল তাঁর জন্মগত সংস্কার। বয়স যখন মাত্র পাঁচ বছর তখনই সুভাষচন্দ্র বাড়ির ছাদে গিয়ে একা-একা ধ্যান করতেন।

কিন্তু রাজনৈতিক জীবনে তিনি জনগণকে বোঝানোর চেষ্টা করেননি — 'ঈশ্বর-আল্লাহ' এক ও অভিন্ন। রাজনৈতিক জীবনে তিনি মহামানব গৌতম বুদ্ধের মতাবলম্বী। ব্যক্তিজীবনের বাইরে ঈশ্বর সম্বন্ধে সুভাষ ছিলেন নীরব।

রাজনৈতিক জীবনে এই ঈশ্বর-আল্লাহ্ বিচিত্র মনোভাবের জন্য ভারত ত্যাগের পর্বে ধর্মের কারণে কেউ তাঁকে আঘাত করেনি। মুসলিম লীগের নেতা জিন্না বা সুরাবর্দি

গান্ধীজিকে মনে করতেন হিন্দুদের নেতা। কিন্তু সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে এই অপবাদ দেবার হিম্মৎ কারও হয়নি। সুভাষ-জিন্নার মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা ও পত্র চালাচালি হয়েছিল। তাতে সুফল ফলেনি কিছু, কিন্তু জিন্না সম্বন্ধে সুভাষ ছিলেন সংযতবাক এবং মুসলিম লীগের কোনও নেতা সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে কখনো কোনো কটু মন্তব্য করেননি। উনিশশো একচল্লিশ থেকে সাতচল্লিশ আপ্রাণ চেষ্টা করেও মহাত্মাজি ভারতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি; কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত সুভাষচন্দ্র তখন ভারতে অনুপস্থিত।

ভারতে আজ যেমন বহু ধর্মের লোকের বাস আজাদ-হিন্দ ফৌজ দলেও ছিল তেমনি বিভিন্ন ধর্মের মানুষ। কিন্তু নেতাজির আদর্শে তাদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ বা রেশারেশি ছিল না। কী মন্ত্রে তিনি সাম্প্রদায়িকতা বিষধরকে ব্যর্থ করেছিলেন সেই কথা বলেই এ গ্রন্থের ছেদ টানব।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, শাহনওয়াজ খান কমিশনের বক্তব্যে হিমালয়ান্তিক ভ্রান্তি লক্ষ্য করে আমি ছুটি নিয়ে (সে সময় আমি ছিলাম পি. ডাবলু. ডি.-র এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার) নিজের খরচে বর্মা-মালয়-জাপান ও তাইহকু চলে গিয়েছিলাম। একাই, ১৯৭০ সালে। ফিরে এসে দুখানি গ্রন্থ রচনা করি : 'আমি নেতাজিকে দেখেছি' — 'প্রত্যক্ষদর্শীর জবানবন্দী' এবং 'নেতাজি রহস্য সন্ধানে'।

নেতাজির স্টেনোগ্রাফার ছিলেন কেরালার মানুষ : ভাস্করনজি। তাঁর কাছ থেকে সংগৃহীত একটি কাহিনী আপনাদের শোনাই। এ কথা আমি আমার পূর্ববর্তী রচনায় ইতিপূর্বে বলেছি, কিন্তু নেতাজি কীভাবে সাম্প্রদায়িকতার সর্বনাশা নাগপাশকে ব্যর্থ করেছিলেন সে কথা বোঝাতে কাহিনীটির পুনরুক্তি অপরিহার্য।

সিঙ্গাপুর ও রেঙ্গুনে সময় পেলেই নেতাজি শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দিরে চলে যেতেন। নির্জন কক্ষে বসে ধ্যান করতেন। মহারাজেরা ব্যবস্থাদি করে দিতেন। বাইরে হয়তো তখন কার্পেট বম্বিং হচ্ছে। নেতাজি টের পেতেন না।

একটি দিনের কথা বলি। সিঙ্গাপুরে চেট্টিয়ার ব্যবসায়ীদের ছিল একটি প্রাচীন শক্তিমন্দির—অম্বামাঈয়ের। মন্দির পরিষদের সভাপতি ছিলেন রেঙ্গুনের ধনকুবের ব্রিজলাল জয়সওয়াল। তিনি নানান ব্যবসার মধ্যে ঠিকাদারিও করতেন। আজাদ-হিন্দবাহিনীর তিনি ছিলেন অর্ডার-সাপ্লায়ার। একদিন তিনি এলেন নেতাজির সঙ্গে দেখা করতে। অর্থাৎ তাঁর ব্যবসায় সংক্রান্ত কিছু সুবিধা আদায় করতে। কিন্তু নেতাজি তাঁকে সে সুযোগ গ্রহণের আগেই বলে ওঠেন, আপনি নিজে থেকে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন শুনে খুশি হলাম। এই তো আমি চাই। আমি কেন চাইব? আজাদ-হিন্দ-ফৌজ তো আপনাদেরই! আপনারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই যে-যা পারেন

দিয়ে যাবেন। আপনি সিঙ্গাপুরের শ্রেষ্ঠ ধনী— আদর্শ স্থাপন তো আপনিই করবেন। তা আজাদ হিন্দের ফান্ডে টাকাটা কি আপনি ব্যক্তিগতভাবে দিচ্ছেন, না আপনার মালয় অটোমোবাইলস্? নাকি আপনাদের চেট্টিয়ার মন্দির পরিষদ?

ব্রিজলালজি প্রথমটা থতমত খেয়ে গিয়েছিলেন। এতক্ষণে হালে পানি পান। বলেন, চেট্টিয়ার মন্দির পরিষদই আজাদ-হিন্দ্ ফান্ডে টাকাটা দান করতে চান; কিন্তু একটি শর্ত আছে, নেতাজি!

তৎক্ষণাৎ নেতাজি বলে ওঠেন, না। শর্ত তো আমি কিছু শুনব না। দান হবে নিঃশর্ত। আপনারা মালয়-বর্মায় এসে কোটি-কোটি টাকা উপার্জন করেছেন ভারতীয় হিসেবে। এ তো দান নিচ্ছি না আমরা, এ আমাদের দাবি। হাজার-হাজার ভারতীয় এ যুদ্ধে বুকের রক্ত দিচ্ছে — আপনাদের কাছে রক্ত চাইছি না আমি, চাইছি অর্থ! এখানে শর্ত কিসের?

হাত দুটি জোড় করে ব্রিজলাল বলেন — আজ্ঞে না, শর্ত ঠিক নয়, এ আমাদের একটা আর্জি: আপনি যদি ট্রাঙ্ক-রোডে আমাদের মন্দিরে পদধুলি দেন তাহলে সেখানেই আপনার হাতে টাকার তোড়াটা আমরা তুলে দিতে পারি একটা সভার আয়োজন করে।

নেতাজি তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করেন — কথাটা আপনার সুরুচিপূর্ণ হল না কিন্তু, জয়সওয়ালজি। মন্দিরে আমি 'পদধুলি' দেব কি? ভক্তদের পদধুলি নিজেই তুলে নেব মাথায়। আপনি শুনে থাকবেন, আমি সুযোগ পেলেই এখানকার শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে গিয়ে ধ্যান করি, প্রণাম করি। কিন্তু সে আমার ব্যক্তিগত ধর্মাচরণ। আজাদ-হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক হিসাবে কোনো সম্প্রদায়ের মন্দিরে যাওয়া আমার উচিত হবে না।

— কেন নেতাজি? আপনি তো হিন্দু?

— না ব্রিজলালজি। সুভাষ বোস হিন্দু। নেতাজি শুধুমাত্র : ভারতীয়।

— তবে সুভাষ বোস হিসেবেই যাবেন।

— যাব। সেক্ষেত্রে ফৌজি পোশাকে নয়। আর তখন টাকাটাও নিতে পারব না আমি। সাধ্যমতো প্রণামী দিয়ে আসবে আপনাদের সুভাষ বোস।

চিন্তায় পড়ে গেলেন ব্রিজলালজি। শেষে বললেন — কিন্তু আমাদের প্রার্থনা ছিল আপনি নেতাজি হিসেবেই যাবেন। সেখানে আমাদের সম্বোধন করে কিছু উপদেশও দেবেন। তা কি কিছুতেই হতে পারে না, স্যার?

চোখ দুটি ধ্বক্ করে জ্বলে উঠল নেতাজির। দৃঢ়স্বরে বললেন, পারে! এক শর্তে। নেতাজি হিসাবে ফৌজি পোশাকে যদি আমি যাই, তাহলে আমার কিছু সহকারীও যাবেন আমার সঙ্গে। তাঁদের মধ্যে — থাকবেন কর্নেল ধীলন—তিনি খালসা শিখ;

থাকবেন আইয়ার — তিনি খ্রিস্টান; থাকবেন জামান কিমানি আর হবিবুর রহমান — তাঁরা দুজন মুসলমান। কী রাজি?

একেবারে নিভে গেলেন ব্রিজলাল। তিনি জানেন, এ একেবারে অসম্ভব কথা। গুজরাটী চেট্টিয়ারদের এ মন্দিরে হিন্দু ব্যতীত কেউ কখনো বাইরের ফটক দিয়ে মাথা গলায়নি বিগত দুশো বছরের ভিতর। ব্রাহ্মণ ছাড়া উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ ছেড়ে কেউ কখনো চাতালে উঠে দেবদর্শন করেনি। একমাত্র মন্দিরের পূজারী ব্রাহ্মণ ব্যতীত কেউ কখনো 'গর্ভগৃহে' প্রবেশ করেনি।

নেতাজি বললেন—আজ আসুন আপনি। মন্দির কমিটির সঙ্গে পরামর্শ করে না হয় আমাকে পরে জানাবেন।

মাথা নীচু করে ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন ধনকুবের।

ঘর খালি হলে নেতাজির স্টেনো ভাস্করন না বলে পারেননি — এ শর্তে ওরা কিছুতেই রাজি হতে পারবে না, নেতাজি!

ম্লান হেসে নেতাজি বলেছিলেন, দেখা যাক।

— তাহলে কিন্তু বেশ কয়েক লক্ষ টাকা ফসকে যাবে।

আবার হেসে উনি বললেন — উপায় কী? তোমাদের নেতাজির 'বিবেক'-এর দাম 'বেশ কয়েক লক্ষ টাকা'র বেশি।

মনে আছে ১৯৭০ সালে ভাস্করনজির কাছে গল্প শুনতে শুনতে এখানে তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিলাম, কথাটা আমার মনে থাকবে। আমার বইতে লিখে দেব। আপনি স্বকর্ণে শুনেছেন যখন।

উনি বলেছিলেন — স্মৃতিচারণটা আমার শেষ হয়নি, মিস্টার সানিয়াল। শুনুন:

পরের দিনই আবার ফিরে এসেছিলেন ব্রিজলাল চেট্টিয়ার, সঙ্গে মন্দির কমিটির আরও পাঁচ-সাতজন কর্মকর্তা। ওঁদের হয়ে জোড়হস্তে ব্রিজলালজি বললেন, মন্দির-কমিটির তরফ থেকে আমরা নিমন্ত্রণ করতে এসেছি, নেতাজি। আপনাকে এবং আপনার সহকর্মীদের।

—আমার খ্রিস্টান এবং মুসলমান বন্ধুদেরও নিমন্ত্রণ আছে তো?

—আলবৎ। আমরা বিবেচনা করে দেখেছি, নেতাজি। মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী অম্বাদেবীর দৃষ্টিতে ওঁরা খ্রিস্টানও নন, মুসলমানও নন — ওঁরা মায়ের সেবক। আমরা ফুলের অর্ঘ দিই, ওঁরা দেন বুকের রক্ত!

ট্রাঙ্ক রোডের ধারে বিখ্যাত সেই চেট্টিয়ার মন্দিরে ভিড়ের মধ্যে উপস্থিত ছিলাম আমিও। বলতে বলতে ভাস্করনজির চোখ দুটো স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে গেল। যেন সেই দৃশ্যটা আবার দেখতে পাচ্ছেন —

'মন্দিরদ্বার' হাট-করে খোলা। কাতারে-কাতারে মানুষ ঢুকছে। যেন 'শকুন্তলা পাঠান মোগল'। নেতাজি প্রায় একশ জন স্থানীয় অনুচর নিয়ে উপস্থিত হলেন মন্দিরদ্বারে। সব ধর্মের ভারতীয়ই আছেন সে জমায়েতে—হিন্দু-মুসলমান-শিখ-খ্রিস্টান। ওঁরা মন্দিরদ্বারে উপস্থিত হওয়ামাত্র হুলুধ্বনি দিয়ে ওঠে গুজরাতি মেয়ের দল। কুমারী, বিবাহিতা, বিধবা। উৎসবের সাজে সুন্দর সেজেছে অল্পবয়সীরা। সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে খই আর ফুল হাতে। পথের ওপর বিচিত্র আলপনা আঁকা। নেতাজি যে পথ দিয়ে এগিয়ে এলেন — আমরা তাঁর পিছন-পিছন — সে-পথে ফুল ছিটাতে-ছিটাতে আগে-আগে শঙ্খ বাজাতে-বাজাতে এগিয়ে গেল মেয়েরা। প্রবেশদ্বারের কাছে বিপরীত দিক থেকে অগ্রসর হয়ে এল একটি গুজরাতি মেয়ে। কুড়ি-একুশ বছর বয়স হবে। অপরূপ সুন্দরী। পরনে আগুন রঙের একটি বেনারসী। সর্বাঙ্গে হীরে-পান্নার জড়োয়া অলঙ্কার। শুনলাম, সে হচ্ছে ব্রিজলাল জয়সওয়ালের একমাত্র দুহিতা। হাতে তার একটি মাঙ্গলিকী-থালা। প্রত্যেকের কপালে একটি করে চন্দনের ফোঁটা এঁকে দিল সে।

নেতাজি তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে এগিয়ে গেলেন। মন্দির-চাতালের সামনে খুলে রাখলেন তাঁর ফৌজি টপ-বুট। দেখাদেখি নগ্নপদ হলেন আইয়ার, জামান কিমানী, ধীলন আর হবিবর রহমান। খালি পায়ে সকলে উঠে এলেন মন্দির-পোতার বারান্দায়। সকলেই যুক্তকর। হোম সদ্য শেষ হয়েছে। নিষ্ঠাবান প্রধান পুরোহিত ওই কয়জনের ললাটে এঁকে দিলেন হোমশিখার জয়তিলক। নেতাজির দেখাদেখি ওঁরা সকলেই যুক্তকরে নমস্কার করলেন। পুরোহিত সকলেরই হাতে দিলেন প্রসাদী পুষ্প। ধ্বনি উঠল জনগণের মধ্যে — না, হর-হর ব্যোম্-ব্যোম্ নয়। অম্বা মাঈকী জয় নয়। আল্লাহ-আকবর বা গড ব্লেস আস নয় — ধ্বনি উঠল : জয় হিন্দ্।

উদাত্ত কণ্ঠে নেতাজি হিন্দীতে বক্তৃতা দিলেন। বিরাট জনতা। স্তব্ধ, মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনল সবাই :

—ভারতমায়ের সন্তান আমরা। আমাদের ধর্ম পৃথক হতে পারে। কর্ম-মাতৃভাষা-পোশাক-বর্ণ আলাদা হতে পারে — তবু আমরা সবাই ভাই। আর সার দিয়ে যাঁরা ওদিকে দাঁড়িয়ে আছেন ওঁরা আমাদের মা-বহিন। আমরা সকলে একই মায়ের সন্তান। আমাদের সেই মা আজ শৃঙ্খলিতা। দুশ বছর ধরে আমাদের মাকে শৃঙ্খলিতা করে রেখেছে বিদেশী বেনিয়ার দল। আমরা সব ভাই মিলে প্রতিজ্ঞা করেছি সেই মাকে শৃঙ্খলমুক্তা করব। তুমি হিন্দু, আমি মুসলমান, তুমি শিখ, আমি খ্রিস্টান—বেশ তো, তাতে কী হয়েছে? কেউ কারও ধর্মে আমরা আঘাত হানব না। ব্যক্তিগত ধর্ম আমাদের মাতৃমুক্তি মন্ত্রে কোনো অন্তরায় হবে না, হতে পারে না। এ মরণপণ যুদ্ধে আমাদের পুকার হচ্ছে : জয় হিন্দ্!

লক্ষ্য করে দেখি, বক্তা ভাস্করনজির চোখদুটি অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে। উনিশশো সত্তর সালে উনি শোনাচ্ছিলেন ত্রিশ বছর আগেকার একটি দিনের কথা।

আজ বিংশ শতাব্দী অতিক্রমণে নয়া শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে এই বৃদ্ধ কথাসাহিত্যিকও স্মৃতিচারণ করছে ত্রিশ বছর আগেকার একটি সন্ধ্যার কথা। অস্তসূর্য উদ্ভাসিত সে সন্ধ্যায় আমি আর ভাস্করনজি বসেছিলাম মুখোমুখি।

★ ★ ★

ইতিমধ্যে ভারত স্বাধীন হয়েছে। আমরা হর-হর ব্যোম্-ব্যোম্ বলে ধ্বংস করে চলেছি অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ। আল্লাহু-আকবর ধ্বনিতে মুম্বাইয়ের শেয়ার মার্কেট উড়িয়ে দিয়েছি। নীল-তারা অভিযানে শিখ সৈনিকদের বাধ্য করেছি অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরের ওপর মেশিনগান চালাতে। উড়িষ্যার বারিপদায় খ্রিস্টধর্মযাজককে সপুত্র পুড়িয়ে মেরেছি! মুসলমান ভোট-ব্যাঙ্কের দিকে লক্ষ্য রেখে ইটন-হ্যারোয় শিক্ষাপ্রাপ্ত আমাদের প্রধানমন্ত্রী সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নির্দেশের ওপর পয়জার মেরে শাহবানুর জেতা-মামলা হারিয়ে দিয়েছেন। তাঁর জননী একনায়ক-শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রেরণায় লোকনায়ক জয়প্রকাশজিকে কারারুদ্ধ করেছেন; তাঁর মাতামহ আজাদ-হিন্দের প্রাক্তন সৈনিকদের পেনশন পাওয়ার অধিকার কেড়ে নিয়েছেন। অপরাধ — তারা ইংরেজের হাত থেকে ভারতকে স্বাধীন করতে চেয়েছিল। অথচ সেই সেনাদলের বশংবদ শাহনওয়াজকে রেলমন্ত্রিত্ব দিয়ে পুরস্কৃত করেছেন! চীনাদের কাছে গো-হারা হেরে কৃষ্ণমেননকে বিতাড়িত করে গদি বাঁচিয়েছেন। দীর্ঘ ডায়ন্যাস্টিক ন্যাস্টি রুলের প্রভাবে ভারতে আজ সাম্প্রদায়িকতা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। আমাদের ডাইনে-বাঁয়ে দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুরা ভয়ে সর্বদা থরহরি কম্পমান!

অথচ মাতৃভূমি থেকে বহু দূরে পরাধীন দেশের বিতাড়িত এক রাজবিদ্রোহী তাঁর আত্মত্যাগ এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠায় সাম্প্রদায়িকতাকে সম্পূর্ণ নির্মূল করেছিলেন। সেই অসাম্প্রদায়িক বাহিনীর পুরোভাগে তিনি যদি সেদিন ভারতবর্ষে উপনীত হতে পারতেন, তাহলে জিন্নাহ্ আর জওহারলাল হয়তো জনগণের প্রচণ্ড কৌতুকে খড়কুটোর মতো উড়ে যেতেন। হয়তো ভারত আদৌ ত্রিখণ্ডিত হত না! জগৎসভায় ভারত আবার শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করত। দুর্ভাগ্য ভারতমায়ের — তাঁর সেই আদরের ছেলেটা ফিরে এল না!

একবিংশ শতাব্দীতে পদার্পণ লগ্নে তাই মন বলতে চায় ওয়ার্ডসওয়ার্থের ঢঙে :

> Netaji ! Thou shouldst be living at this hour !
> India hath need of thee.